পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ❑ ৯ম সংখ্যা

১৫ নভেম্বর, ১৯৯৯ ঈসাব্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হুযূর আকদস (আইঃ)-এর সাথে লন্ডন জলসা '৯৯ বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ ঃ ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ও তাঁদের সাথে লন্ডনস্থ বাংলা ডেস্ক-এর মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবকে দেখা যাচ্ছে।

রুশ অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ আধ্যাত্মিক বিশ্ব খলীফার সান্নিধ্যে।

দুই আমীরের সাক্ষাৎ ঃ বামে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল আমীর ডাঃ ইফতেখার আইয়ায ও ডানে জার্মানী জামাতের ন্যাশনাল আমীর আব্দুল্লাহ্ ওয়াগেস হাউযার। মাঝখানে যুক্তরাজ্য জামাতের নায়েব আমীর ও লন্ডন মসজিদের ইমাম মাওলানা আতাউল মুজীব রাশেদ।

"তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত করো"

ইলাহী জামাতের ইহাও একটি নিদর্শন যে, এর সমস্ত স্থান ও স্থাপনাসমূহ সর্বদা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। আসলেই কি ক্ষুদ্রতর হতে থাকে ? ক্ষুদ্রতর হওয়া উন্নতির তো লক্ষণ নয়। যে অর্থে ক্ষুদ্রতর মনে করা হয় সে অর্থে ক্ষুদ্রতর হয় না। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রয়োজনের তুলনায় স্থানসমূহে সংকুলান না হওয়ার কারণে ক্ষুদ্রতর হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে ইলহাম মারফত এ নির্দেশ দিয়েছেন – ওয়াস্সে মুকানাকা অর্থাৎ তোমার গৃহকে সম্প্রসারিত করো। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর নিকট অর্থাৎ কাদিয়ানে এত লোকের সমাগম হতে থাকে যে, তাঁর (আঃ) সময়ে কাদিয়ানের মসজিদ-মেহমানখানাগুলোকে সম্প্রসারিত করতে থাকতে হয়েছে। এ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া দেশ-কাল অতিক্রম করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চলছে। সেই কাদিয়ানের কথাই ধরুন, যেখানে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭৫ জনকে নিয়ে সালানা জলসা শুরু হয়েছিলো সেখানে শত বার্ষিকী জুবিলী জলসায় লোক সমাগম হয়েছিলো প্রায় ২৫ হাজার। সুতরাং সম্প্রারণের হার কোন গাণিতিক হারে যে আবদ্ধ করা যাবে না তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশ জামাতের সম্প্রসারণের বিষয়টাকেও খাটো করে দেয়ার অবকাশ নেই। আল্লাহ্তাআলা এত কল্যাণ-মন্ডিত করেছেন যে, দারুত তবলীগে এখন জলসা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও অবস্থার মোকাবেলা করার নিমিত্তে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে হাত দিয়েছি আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:)-এর নির্দেশ ও দোয়া নিয়ে। আল্লাহ্তাআলার ফযলে ইতোমধ্যে দোতলার ছাদ পর্যন্ত ঢালাই-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামী জলসার পূর্বে তেতালার ছাদ নির্মাণের কাজ আমরা সম্পন্ন করার আশা রাখি।

উল্লেখ্য, এ বিরাট কাজে হাত দেয়ার পূর্বে আমরা এর খরচ নির্বাহের জন্যে প্রত্যেক জামাত থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম। অনেকে তাদের ওয়াদা আদায় করে দিয়েছেন, যাজাহুমুল্লাহ্। যারা আদায় করেন নি সত্বর তাদের ওয়াদা পূরণ করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যারা ওয়াদা করেন নি তাদেরকেও ওয়াদা করে তা আদায় করে এ ঐশী কর্মকান্ডের সাথে অংশ নেবার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

খুলনার মসজিদে বোমা হামলার প্রেক্ষিতে জামাতে যে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলা করার জন্যেও আমাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। শহীদানের পরিবারের বরণ-পোষণ, আহতদের চিকিৎসা এবং এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতে আমাদেরকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। সুতরাং এ ব্যয়ভার জামাতের বন্ধুগণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে মিটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জামাতের মোখাইয়ার আহবাবের দৃষ্টি বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জামাতের সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করে জরুরী তহবিলে বেশী বেশী করে চাঁদা দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রবাসী আহমদী ভাই-বোনের দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করছি। তাঁরাও এ মহান কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ)-এরও অনুমতি রয়েছে।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলের সহায় হউন, আমীন ॥

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা

১ অগ্রহায়ণ ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ৫ শাবান ১৪২০ হিঃ কাঃ
১৫ নবুওয়ত ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৯৯ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১৩৪১৪

সম্পাদকীয়

শবে বরাতের কথা

'শবে বরাত' শব্দটি পারসী শব্দ। 'শব' মানে রাত্র আর 'বরাত' মানে অংশ, ভাগ্য। শবে বরাত বলতে সাধারণ্যে ইহা সৌভাগ্য-রজনী বলে কথিত হয়ে থাকে। এদিন আল্লাহ্‌তাআলা নাকি সকলের ভাগ্য বন্টন করেন। শা'বান মাসের মধ্যম তারিখে ধুম-ধাম করে ইহা পালন করা হয়। অনেকে ইহাকে 'লায়লাতুম্ মুবারাকাতুন' বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু 'লায়লাতুল কদর' থেকে বরকতপূর্ণ রাত্র আর কি হতে পারে যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তা হাজার মাস থেকেও উত্তম ?

শবে বরাত উপলক্ষ্যে নফল রোযা রাখা হয় এবং সারা রাত ধরে নফল নামায পড়ে আগামী বছরটি যাতে সৌভাগ্যপূর্ণ হয় সেজন্যে দোয়া করা হয়। ভাল ভাল খাদ্য বিশেষ করে হালুয়া রুটি তৈরী করে গরীব-মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উহুদের যুদ্ধে হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাঁত শহীদ হয়ে গেলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) হালুয়া রুটি তৈরী করে হুযূর (সঃ)-কে খাওয়াবার জন্যে গুহায় গুহায় তাঁকে (সঃ) অন্বেষণ করেছিলেন, ঐ স্মৃতিস্বরূপ নাকি এ হালুয়া রুটি। এখানে একথা বলে রাখা ভাল যে, উহুদের যুদ্ধ হয়েছিলো শওয়াল মাসে। ইতিহাসের প্রত্যেক পাঠকেরই তা জানা থাকার কথা। এ রাত্রে ঢাকা শহরে বাজি পটকা ফাটানোর ধুম পড়ে যায়। অবশ্য ইদানিং শান্তি-শৃংখলা রক্ষার লক্ষ্যে পুলিশী নিষেধাজ্ঞার কারণে এর প্রবণতা কিছুটা কমে গেছে। মাযারগুলো নতুন সাজে হয় সজ্জিত এবং নানা প্রকার বিদআত সংঘটিত হয় এগুলোকে ঘিরে। আলোক সজ্জা করার প্রচলনও রয়েছে এ রাত্রে। ঐদিন সরকারী ছুটিও থাকে।

কুরআন, সুন্নাহ্ ও হাদীসের শিক্ষার পরিপন্থী এবং এর সমর্থন নেই এমন যে কোন কর্ম-কাণ্ড আপাতঃ দৃষ্টিতে তা যতই ভাল বলে মনে হোক না কেন বা ধর্মীয় অঙ্গ হিসেবে প্রচলিত হয়ে থাক না কেন, ইসলামে তা নিষিদ্ধ। ইহাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় বিদআত। নবী আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন–কুল্লু বিদাআতিন যালালাতুন ওয়া কুল্লু যালালাতিন ফিন্নার অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিদাআতই পথভ্রষ্টতা আর সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা (মানুষকে) আগুনে তথা জাহান্নামে নিয়ে যায় (হাদীস)। বিদাআত বন্ধু বেশে সমাজে প্রবেশ করে সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে।

আমাদের ছেলে-পেলেদের এবং নবাগতদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমরা আহমদীরা কেন এত বড় একটা অনুষ্ঠান পালন করি না। এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের সর্বদা জেনে রাখা উচিত যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম এসেছেন সকল প্রকার বিদআত ও কুসংস্কার মিটিয়ে দিয়ে সত্যিকারের নির্ভেজাল ইসলাম শিখাতে ও চর্চা করাতে। কুরআন, সুন্নাহ্ ও হাদীসে শা'বান মাসে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান পালনের সহী সনদ ও সমর্থন পাওয়া যায় না। নবী করীম (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও এসব পালনের সনদ পাওয়া যায় না। এমন কি সৌদি আরবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোতে এখনও ইহা পালিত হয় না। যদিও কতিপয় হাদীস দ্বারা এর সমর্থন যোগানোর চেষ্টা করা হয় তবে এসব হাদীসের সত্যা-সত্যের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইহা বিজাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টি থেকে যে ইসলামে আমদানী করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজা ও দেওয়ালী উৎসবে প্রভাবান্বিত নয় তা-ও জোর করে বলা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকেন– মোঘল আমলে ইহা পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে পালন করা আরম্ভ হয়।

হাদীস পাঠে জানা যায় যে, নবী করীম (সঃ) হঠাৎ করে কোন প্রকার ইবাদত শুরু করতেন না বা হঠাৎ করে ছেড়েও দিতেন না। তাঁর (সঃ) রীতি ছিলো, তিনি রমযানের আগ থেকে অর্থাৎ শা'বান মাসে বেশী বেশী নফল রোযা রাখতেন এবং নফল নামায পড়তেন। আবার রমযান শেষ হলেও শাওয়াল মাসে নফল রোযা রাখতেন। প্রতি মাসেও তিনি কিছু কিছু নফল রোযা রাখতেন। তাই কেউ যদি শা'বান মাসে নফল রোযা রাখে এমন কি নিসফুশ্ শা'বান বা শা'বানের মধ্যম দিনে নফল রোযা রাখে বা নফল নামায পড়ে তাহলে আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু এটাকে একটা বিশেষ সওয়াব এমনকি সারা বছরের ইবাদতের চেয়েও অধিক মর্যাদা দান করা অবশ্যই সিদ্ধ নয়। সাধারণভাবে এ রাত্র নিয়ে যে আকীদা বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে তা আরও মারাত্মক। মনে করা হয় যে, এ রাত্রে আল্লাহ্‌তাআলা রুজি বন্টন করেন। যার সম্পদ সীমিত এবং যার ক্ষমতাও সীমিত তাকে পরিকল্পনা করতে হয়, বাজেট করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা যেহেতু সীমাহীন সম্পদ ও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি অযাচিত-অসীম দাতাও বটেন, তাই তাঁর ক্ষেত্রে এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করা তাঁর শান, মকাম ও মর্যাদার পরিপন্থী। আল্লাহ্‌তাআলা চাইলে যে কোন সময় যে-কাউকে যত ইচ্ছা দান করতে পারেন এজন্য তাঁর হিসাব-কিতাব করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌তাআলা এসব বিদাআত ও কুসংস্কার থেকে সকলকে রক্ষা করুন।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ মিথ্যাচারিতা	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা - মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ কাদিয়ান জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ প্রতিবেদক - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ ইসলাম এবং এদেশের ধর্ম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৫–৬
❑ জুমুআর খুতবা ঃ রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) আনুগত্যেই আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ হয় হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ – মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭–১০
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আহমদী শহীদগণের স্মরণে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা সালেহ আহমদ	১১–১৬
❑ সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহে রাবে'(আইঃ)-এর স্বপ্ন ও দিব্য-দৃষ্টি সংকলন - জনাব মির্যা খলীল আহমদ কমর	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৭–১৮
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	১৯–২০
❑ জেলা সাতক্ষীরার সাত শহীদের কথা	ঃ আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২১
❑ রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঃ জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল মুনীর	ঃ অনুবাদ - নাজির আহমদ ভুঁইয়া	২২–২৪
❑ ছোটদের পাতা ঃ মেরে বাচপানকে দিন (আমার বাল্যকাল) মিসেস সফীয়া বেগম	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৫–২৬
❑ মসজিদে বোমা ঃ জাতির বিবেক সমকালীন পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতে	ঃ প্রতিবেদক	২৭–৩১
❑ কবিতা - শহীদের স্মরণ	ঃ জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব (জয়)	৩১

প্রচ্ছদ ঃ ইউ.কে. জলসা-১৯৯৯ ঃ হুযূর (আইঃ) জলসা গাহে যাচ্ছেন।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক 'হাকীকাতুল ওহী' প্রকাশিত হয়েছে

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ কর্তৃক **'সুলতানুল কলম' হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালাম প্রণীত 'হাকীকাতুল ওহী'** গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হলো, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

সুদৃশ্য প্রচ্ছদে সাড়ে তিনশত পৃষ্ঠার 'হাকীকাতুল ওহী' পুস্তকের শুভেচ্ছা মূল্য রাখা হয়েছে ১০০/= টাকা এবং বহির্দেশের জন্য $ 5 ডলার। সকলকে এর কপি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রিয়জনকে উপহার হিসেবেও ইহা দেয়া উত্তম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস্ সালাম **'হাকীকাতুল ওহী'** পুস্তক সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামকে বলেন ঃ

"আমি আমার প্রিয় জাতির শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মাশায়েখগণকে এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা এই গ্রন্থ পড়িতে পারেন তাহাদিগকে খোদাতাআলার কসম দিতেছি যে, যদি তাহাদের নিকট এই গ্রন্থ পৌঁছে তবে তাহারা যেন অবশ্যই মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নেন। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পুনরায় এক-অদ্বিতীয় খোদা, যাঁহার হাতে সকলের প্রাণ আছে, তাঁহার কসম দিতেছি যে, তাহারা যেন তাহাদের সময় ও কাজ-কর্মের ক্ষতি করিয়াও মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নেন। অতঃপর আমি তৃতীয়বার তাহাদিগকে ঐ আত্মাভিমানী খোদা, যিনি ঐ ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন, যে তাঁহার কসমের পরোয়া করে না, তাঁহার কসম দিতেছি যে, যাহাদের নিকট এই গ্রন্থ পৌঁছে ও যাহারা ইহা পড়িতে পারেন তাহারা মৌলবীই হউন বা মাশায়েখ হউন, অবশ্যই যেন গ্রন্থটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একবার পড়িয়া নেন।"

কুরআন মাজীদ

সূরাতুল আন'আম - ৬

৭৫। এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্‌রাহীম তার পিতা আযরকে [৮৬৪] বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিসমূহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করছ ? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার জাতিকে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।'

৭৬। আর এভাবে আমরা ইব্‌রাহীমকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা [৮৬৫] দেখালাম (যেন তার জ্ঞান পূর্ণ হয়) এবং যেন সে দৃঢ় বিশ্বাসীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭৭। এবং যখন রাত্রি তার উপর অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, তখন সে একটি নক্ষত্র দেখল। সে বল্‌ল, 'ইহা আমার প্রভু (হতে পারে)?' কিন্তু উহা যখন অস্তমিত হ'ল, তখন সে বল্‌ল, 'আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না।'

৭৮। অতঃপর, যখন সে চন্দ্রকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখল, সে বলল, 'ইহা আমার প্রভু (হতে পারে) ?' অতঃপর, যখন উহা অস্তমিত হ'ল, সে বল্‌ল, 'যদি আমার প্রভু আমাকে হেদায়াত না দিতেন, তাহ'লে নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।'

৭৯। অতঃপর, যখন সে সূর্যকে জ্যোতির্ময়রূপে দেখল, তখন সে বল্‌ল, 'ইহা আমার প্রভু (হতে পারে) ? ইহা সর্বাপেক্ষা বড় !' অতঃপর যখন উহাও অস্তমিত হ'ল, তখন সে বল্‌ল, 'হে আমার জাতি! তোমরা যা (আল্লাহ্‌র সৃষ্টি) শরীক কর আমি উহা হতে মুক্ত; [৮৬৬]

৮৬৪। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম গ্রন্থে হযরত ইব্‌রাহীমের পিতার নাম তেরহ্ দেয়া হয়েছে (আদিপুস্তক-১১ঃ২৬) এবং নুতন নিয়মেও তেরহ্ লিখিত হয়েছে (লুক-৩ঃ৩৪)। তালমূদ্ লুকের সাথে একমত। গির্জা বা যাজক সংক্রান্ত ইতিহাসের প্রবর্তক, ইউসিবিয়াস (Eusebius) ইবরাহীমের পিতার নাম আথার (Athar) বলে উল্লেখ করেছেন (Sale)। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদীদের মধ্যেও ইব্‌রাহীমের পিতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। আদি-পুস্তক এবং লুক-এর সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করার কোন জোরালো কারণ ইউসিবিয়াসের অবশ্যই ছিল। আথার (Athar) ই সঠিক বলে মনে হয় যা পরবর্তী কালে তেরহ্ বা থারা'তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। "আথার" কুরআনে উল্লেখিত নামের (আযর) প্রায় সমরূপ, উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া শব্দ দু'টির আকার প্রায় একই। অতএব, খৃষ্টান লেখকগণের কুরআন্ করীমের সঙ্গে বিতন্ডা করার কোন কারণ থাকতে পারে না। এই কারণে যে, এর মধ্যে ইব্‌রাহীমের পিতাকে 'আয্‌র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া, তালমূদ কিতাবে ইব্‌রাহীমের পিতার নাম 'তেরহ্' রাখা হইয়েছে (Sale)। এবং 'যারাহ্' শব্দটি 'আযর' এর প্রায় কাছাকাছি। এতে প্রতিপন্ন হয় যে, কুরআনের বিবরণ অধিক নির্ভরযোগ্য। তদুপরি আযরকে কুরআনে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর আব্ (২৬ঃ৮৭) বলা হয়েছে। 'আব' শব্দ পিতা, চাচা বা পিতামহ প্রভৃতির জন্য প্রয়োগ হয়ে থাকে। ২ঃ১৩৩ আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর চাচা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে তাঁর 'আব্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে কুরআন্ হতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আয্‌রকে যদিও ইব্‌রাহীমের "আব্" বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ তিনি তাঁর পিতা ছিলেন না। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ), তাঁর 'আব্' আযর-এর নিকট ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট জানতে পারলেন যে, 'আযর' আল্লাহ্‌তাআলার শত্রু তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তার জন্য দোয়া করা হতে বিরত রইলেন; এমনকি, প্রকৃতপক্ষে দোয়া করতে তাঁকে বারণ করা হয়েছিল (৯ঃ১১৪)। কিন্তু ১৪ঃ৪২ আয়াতে ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর ওয়ালিদ-এর জন্য দোয়া করেছিলেন, 'ওয়ালিদ' শব্দ পিতার জন্য প্রয়োগ হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'আযর' যাকে ইব্‌রাহীমের 'আব্' বলা হয়েছে তিনি তাঁর 'ওয়ালিদ' অর্থাৎ পিতা হতে ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি তাঁর চাচা ছিলেন। বাইবেলের কোন কোন অংশও এই অনুমান সমর্থন করে। তেরহ্-এর কন্যা 'সারাহ্'কে ইব্‌রাহীম বিবাহ করেছিলেন (আদি পুস্তক-২০ঃ১২)। এতেও প্রতিপন্ন হয় যে, তেরহ্ তাঁর পিতা ছিলেন না কারণ তিনি তাঁর ভগ্নীকে বিবাহ করতে পারেন না। বোধ হয় তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর চাচা আযর বা আথার তাকে লালন পালন করেছিলেন এবং তার কন্যা সারাহ্‌কে তাঁর তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। যেহেতু আয্‌র ইব্‌রাহীমকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তার পিতৃতুল্য ছিলেন, সেই কারণে তাঁর পুত্র বলতেন এবং এই জন্য আয্‌র বা আথারকে ইব্‌রাহীমের প্রকৃত পিতা বলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তাল্‌মূদ কিতাব হতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, আয্‌র প্রতিমাগুলি ভাঙ্গার অপরাধে ইব্‌রাহীমকে অভিযুক্ত করেছিল এবং বিচারের জন্য রাজার নিকট নিয়েছিল। যদি আয্‌র ইব্‌রাহীমের পিতা হতেন তা হলে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে হয়ত এমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না।

৮৬৫। এই আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌তাআলা ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে এবং সব কিছুকে পরিব্যাপ্তকারী ঐশী-ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন।

৮৬৬। ৭৭-৭৯ আয়াত প্রকাশ করে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর (প্রতিমা-পূজারী) জাতিকে তাদের অদ্ভুত হাস্যকর বিশ্বাস সম্পর্কে ভালভাবে উপলব্ধি করাবার জন্য এক যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তা হ'ল, তাদের তো চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক খোদা আছে, যাদের উপাসনা তারা করে (যিউ এনসাই)। এই আয়াতগুলো হতে ইহা অনুমান করা ভুল হবে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নিজেই অন্ধকারে পথ হাতড়াতে ছিলেন এবং তিনি জানতেন না যে, কে তাঁর প্রভু ছিলেন, এবং একের পর এক সন্ধ্যার নক্ষত্র, চন্দ্র এবং তারপর সূর্যকে আপন প্রভু মনে করলেন এবং একে একে যখন সব অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি উহাদের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করলেন, এবং এক আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রকৃতপক্ষে, বহু যুক্তি-সম্বলিত এই ঘটনা প্রমাণ করছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আকাশের এই সকল বস্তুকে প্রভুরূপে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং তিনি তার জাতির লোকদিগের বিশ্বাসের অসারতাই ধাপে ধাপে তাদিগকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ৭৫-৭৬ আয়াত প্রকাশ করে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার একত্বে অটল বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই, তিনি অন্ধকারে ঘুর পাঁক খাওয়ার মত এবং এক প্রতিমা হতে অন্য প্রতিমার দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলার মত বিবেচিত হতে পারেন না। "ইহা আমার প্রভু (হতে পারে) ?" এই শব্দগুচ্ছ নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেছিল। এই কথাগুলো দ্বারা তিনি তাঁর জাতির লোকের বিশ্বাস মতে নক্ষত্র যে তাদের প্রভু ছিল তৎপ্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তদুপরি তিনি তো পূর্বেই জানতেন যে, সূর্য অস্ত যাবেই। এমতাস্থায় তাঁর যুক্তির মধ্যে "আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না" কথাগুলো তো পূর্বাহ্নেই তাঁর অন্তরে ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত কার্যকররূপে তাঁর যুক্তির অবতারণা করতে চেয়েছিলেন। এইরূপে, প্রথমে নক্ষত্রকে তাঁর বলে সাময়িকভাবে বাহানা করেছিলেন এবং যখন উহা অদৃশ্য হয়ে গেল, তাদিগকে সঠিক বিষয় উপলব্ধি করাবার জন্য অনতিবিলম্বে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলেন, "আমি অস্তগামীদিগকে ভালবাসি না।" একই ব্যাপার ঘটেছিল চন্দ্র এবং সূর্য অদৃশ্য হওয়াতে। সূর্য সম্পর্কে তিনি "বৃহত্তর" বা "বৃহত্তম" শব্দ ব্যবহার করেছিলেন বিদ্রূপাত্মক সুরে– তাঁর জাতিকে তাদের বোকামীর জন্য উপহাস করার উদ্দেশ্যে। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যুক্তির যে ধারা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, উহা দ্বারা ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে ক্রমশঃ আল্লাহ্‌তাআলার দিকে আকর্ষণ করতে চাচ্ছিলেন। ৮০-৮২ আয়াতের উপরে ভাসা-ভাসাভাবে দেখলেও ইহা স্ফটিকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার উপর কেবল অটল ঈমানই রাখতেন না, পরন্তু ঐশী-সিফত্ (গুণাবলী) সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা

কুরআন ঃ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝

অনুবাদ ঃ তোমরা মূর্তিপূজার শিরক হতে বাঁচো এবং মিথ্যা হতে দূরে থাকো (হজ্জ ঃ ৩১)।

হাদীস ঃ

'আন আবি বাকরাতা (রাঃ) ক্বলা ক্বলা রসূলুল্লাহি (সঃ) আলা উনাব্বিউকুম বিআকবারিল কাবায়িরি সালাসানা-ক্বলু বালা ইয়া রসূলাল্লাহি-ক্বলা আল্ ইশরাকু বিল্লাহি ওয়া উকুকুল ওয়ালিদায়নে, ওয়া জালাসা ওয়া কানা মুক্তাকিয়ান ফাক্বলা, আলা ওয়া কুওলায্ যূরি, ফামা যালা ইউকাররিরুহা হাত্তা কুলনা লায়তাহূ সাকাতা (বুখারী)।

অর্থ ঃ হযরত আবূ বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের তিনটি বড় গুনাহ সম্বন্ধে অবগত করব ? আমরা বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন, তিনি (সঃ) বল্লেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতামাতার অবাধ্যতা করা, তিনি (সঃ) তখন হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বল্লেন খবরদার মিথ্যা কথা বলা হতে বাঁচো তিনি (সঃ) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বল্লাম, হায়! যদি তিনি (সঃ) চুপ করে যেতেন (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদিগকে জনাচ্ছে যে, মূর্তি পূজা ও মিথ্যাচারিতা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা হতে দুরে নিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন যে, অংশীবাদিতা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। ইহা এক অযথা কথা। যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয় তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানে না যে, খোদার আশীষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মাবূদ মনে করে। এজন্যে আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা হতে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**, সদর মুরব্বী

কাদিয়ানে ১০৮তম সালানা জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এবার জলসায় যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি হুযূর (আইঃ)-এর সমাপ্তি ভাষণ শোনার উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছেন ঃ

১। প্রীতম সিংহ ভাটিয়া, মেম্বর, গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটি
২। তুরপত রাজিন্দার সিংবাজুওয়া, পাঞ্জাবের সাবেক মন্ত্রী
৩। আর এ ভাটিয়া, মেম্বর পার্লিয়েমেন্ট ও সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ভারত
৪। মাথ সিং ওয়ালম, এম, এল, এ
৫। প্রতাপ সিং বাজুওয়া, সাবেক মন্ত্রী, পাঞ্জাব
৬। সুরেন্দর সিং, ইনকামটেক্স কমিশনার অমৃতসর ও জম্মু কাশ্মীর। তাছাড়া সরদার সোওয়ার্ন সিং, প্রিন্সিপাল, কাদিয়ানের নিকটবর্তী রিয়াগ কলেজ। তিনি বি. এ. ক্লাসের ১ম ও ২য় বছরের ১৩৫ জন ছাত্রীসহ এই ভাষণ শোনার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তাছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে কলেজের সমস্ত স্টাফ।

১০৮তম সালানা জলসা ১৩ নভেম্বর শুরু হচ্ছে। আজ ১৫ নভেম্বর সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। ভারতের দূর দূর অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য ২০টি দেশ থেকে মেহমান জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। রৌদ্রস্নাত মনোরম মওসুম বিরাজ করেছে। জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা ২১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। জলসাগাহ্ সম্প্রসারিত করতে হয়েছে। বিগত বছর উপস্থিতি সংখ্যা ১৫,৩১৩ ছিল।

বাংলা, মালায়ালম, তামিল, তিল্কঙ্গু, কর্ণাটক এবং ইংরেজী এই ছয়টি ভাষায় বক্তৃতাসমূহের তরজমার ধারা ভাষ্যের ব্যবস্থা করা হয়। ২৭ পত্র-পত্রিকায় জামাত আহমদীয়ার সম্পর্কে প্রবন্ধ-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ১৫টি পত্র-পত্রিকায় জলসা সংক্রান্ত সংবাদের পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং খলীফাগণের ছবিও ছাপা হয় এবং মিনারাতুল মসীহ্‌র চিত্রও। জলন্ধর টি. ভি জলসার বিভিন্ন ঝলক সম্প্রচার করে। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই ধর্মীয় পরমত সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানের জন্য আদর্শস্বরূপ অবস্থান করছি। বিবিসি লন্ডনও উক্ত জলসার প্রশংসনীয় সংবাদ প্রচার করছে এবং বিবিস লন্ডন ও উক্ত জলসার প্রশংসনীয় সংবাদ প্রচার করেছে ২১ হাজার উপস্থিতির আনুমানিক সংখ্যা বর্ণনা করেছিল যা প্রকৃতপক্ষে ছাড়িয়ে গেছে। ১৬ হাজারের অধিক সংখ্যক নও মুবাঈন (নবদীক্ষিত) আহ্‌মদী মুসলমান এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছে। বিগত বছর তাদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের উর্ধ্বে। বিরুদ্ধবাদীদের শত বাধাকে ভ্রুক্ষেপ না করেও তাঁরা জলসায় যোগদান করেন। হুযূর (আইঃ) এবার কেবল সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। পরে জানা যায় ১৮৯৯ সনের জলসায়ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কেবল সমাপ্তি ভাষণই প্রদান করেছিলেন। এইভাবে আল্লাহ্‌র ফযলে কাকতালীয়ভাবে সিলসিলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। হুযূরের (আইঃ) ভাষণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। (এমটিএ থেকে শ্রুত)

প্রতিবেদক - **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমদ**

সন্তান লাভ

মহান স্রষ্টার অশেষ রহমতে গত ২২-১০-৯৯ ইং রোজ শুক্রবার আমরা একটি পুত্র সন্তান লাভ করেছি। বর্তমানে নবজাত সন্তান ও তার মাতা সুস্থ আছে। জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট নবজাতকের উত্তম খাদেমে দীন হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ আনসার উদ্দিন
দাইয়ানে ইলাল্লাহ্ ও মিসেস তাছলিমা
বেতাগী, কাউনিয়া

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

ইসলাম ও এদেশের অন্যান্য ধর্ম

(শেষ কিস্তি)

এছাড়া আরও শত শত এমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেগুলো নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ হয়েছে। একবার মৌলভী নূরদ্দীন সাহেবকে অগ্রিম সংবাদ প্রদান করা হয়, তাঁর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে এবং এর গায়ে কয়েকটি ফোঁড়াও থাকবে। বাস্তবে এমনই হলো। তাঁর এক পুত্রসন্তান হলো যার গায়ে কয়েকটি ফোঁড়াও ছিল। উক্ত মৌলভী সাহেব এই সমাবেশে উপস্থিত। তাঁকে যে কেউ আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করতে পারে। মালির কোটলার জমিদার সর্দার মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের আব্দুর রহীম নামক ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর নৈরাশ্যজনক অবস্থা দেখা দেয়। আমাকে ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলা সংবাদ দিলেন, তোমার সুপারিশে এই ছেলে আরোগ্য লাভ করতে পারে। তদানুযায়ী, আমি এক স্নেহশীল শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে তার জন্য অনেক দোয়া করি, আর সেই ছেলে ভাল হয়ে যায়। এ যেন এক মৃত ব্যক্তির জীবন লাভ করা! ঠিক তেমনি তাঁর দ্বিতীয় ছেলে আব্দুল্লাহ্ খানের অসুখ হয়। সে-ও মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে। তার আরোগ্যের বিষয়েও আমাকে সংবাদ দেয়া হয়, আর সে-ও আমার দোয়ায় সেরে ওঠে।

একইভাবে আরও অনেক নিদর্শন আছে। যদি এদের সবক'টা লেখা হয় তবে দশ দিনেও এ প্রবন্ধ শেষ হবে না। এসব নিদর্শনের কেবল দু'একজন সাক্ষী নন বরং কয়েক লক্ষ মানুষ এদের সাক্ষী। অর্থাৎ সেই নিদর্শনসমূহ থেকে দেড়শ' নিদর্শন আমি আমার নুযূলুল মসীহ্' নামক বই-এ অন্তর্ভুক্ত করেছি যা অচিরেই প্রকাশিত হবে। এসব নিদর্শন কয়েক প্রকার। কয়েকটি আকাশে প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটি ধরাপৃষ্ঠে। কয়েকজন বন্ধুর বিষয়ে আবার কতিপয় শত্রুদের বিষয়ে পূর্ণ হয়েছে। কিছু সংখ্যক আমার নিজ ব্যক্তি-সংক্রান্ত, কিছু সংখ্যক আমার সন্তানদের সম্বন্ধে, আবার কিছু এমন নিদর্শনও রয়েছে যা আমার সাথে কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা ছাড়াই শত্রুর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন কসূর নিবাসী মৌলভী গোলাম দস্তগীর 'ফতেহ রহমান' নামক তার বই-এ নিজে থেকেই আমার সাথে মোবাহালা করেন আর দোয়া করেন দু'জনের মাঝে যে মিথ্যাবাদী তাকে যেন খোদা ধ্বংস করে দেন। তদনুযায়ী এই দোয়ার পর মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হ'তে না হ'তেই উক্ত মৌলভী সাহেব নিজেই মৃত্যুবরণ করে আমার সত্যতার সাক্ষী দিয়ে গেলেন। এছাড়া হাজার হাজার মানুষের কাছে খোদাতাআলা আমার সত্যতা কেবল স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মোট কথা, এসব নিদর্শন এত প্রকাশ্য যে, এদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে মানুষের জন্য স্বীকার করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না।

এযুগের কোনো কোনো বিরোধী একথাও বলেন, যদি কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণ পাই তবে আমরা মেনে নিব। আমি প্রত্যুত্তরে তাদেরকে বলছি, কুরআন শরীফে আমার মসীহ্ হবার বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। আমি এ বিষয়ে কিছুটা ইতোমধ্যে লিখেছি। সংক্ষেপে, এসব নিদর্শন এত প্রকাশ্য যে, এদেরকে একত্রিত আকারে দেখলে মানুষের জন্য গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না যার কিছুটা আমি উল্লেখও করেছি।

তাছাড়া, এই শর্ত আরোপ করাটাও একটা প্রকাশ্য বাড়াবাড়ি ও অন্যায় দাপট। একজন ব্যক্তিকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করার জন্য তাঁর আগমনের প্রকাশ্য সংবাদ কোনো ঐশী গ্রন্থে বিদ্যমান থাকাটাও আবশ্যক নয়। যদি এটি আবশ্যক শর্ত হয় তা হ'লে একজন নবীরও নবুওয়ত সাব্যস্ত হবে না। প্রকৃত সত্য হ'লো, এক ব্যক্তির নবুওতের দাবীর বিষয়ে সর্বপ্রথমে যুগের-চাহিদা লক্ষ্য করা হয়। এরপর সে নবীদের নির্ধারিত যুগে এসেছে কিনা এটাও দেখা হয়। আবার, খোদাতাআলা তাকে সমর্থন করেছেন কিনা-এটাও চিন্তা ক'রে দেখতে হয়। এছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি-অভিযোগের পূর্ণ ও সমীচীন জবাব দেয়া হয়েছে কি না ! যদি এসব বিষয় সাব্যস্ত হয় তবেই সে ব্যক্তিকে সত্য বলে মান্য করা হবে, তা নইলে নয়। এটা অতীব স্পষ্ট বিষয়। বর্তমান যুগ নিজ অবস্থা দ্বারা আকুতি জানাচ্ছে- এ সময় ইসলামের অভ্যন্তরীণ দলাদলি দূরীভূত করার লক্ষ্যে, বহিরাক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য আর বিলুপ্ত আধ্যাত্মিকতাকে জগতে পুনরায় প্রতিষ্ঠাকল্পে নিঃসন্দেহে একজন ঐশী সংস্কারকের প্রয়োজন যিনি পুনরায় পূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে ঈমানকে সতেজ করবেন। এ প্রক্রিয়ায় তিনি মানুষকে মন্দকর্ম ও পাপ থেকে মুক্ত করে পুণ্য ও সততার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। সুতরাং ঠিক প্রয়োজনের সময় আমার আগমন এত স্পষ্ট একটি বিষয় যে, ঘোর বিরোধী ছাড়া অন্য কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ নবীদের ধার্যকৃত সময়ে ব্যক্তির আগমন ঘটেছে কি না- এ শর্তটিও আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়েছে। কেননা, নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- যখন ষষ্ঠ সহস্র শেষ হবার উপক্রম হবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং চন্দ্র হিসাবে হযরত আদমের যুগ থেকে গণনা করলে ষষ্ঠ সহস্র এক যুগ পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে আর সৌর হিসাবে ষষ্ঠ সহস্র প্রায় শেষ হবার পথে। এছাড়া আমাদের নবী (সঃ) বলেছিলেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে একজন মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) আগমন করবেন যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। বর্তমানে চর্তুদশ শতাব্দীর একুশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে আর এখন বাইশ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। এটা কি একথার যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, সেই মোজাদ্দেদ ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন? তৃতীয় শর্ত ছিল, খোদাতাআলা দাবীকারকের সমর্থন করেছেন কি না! সুতরাং এই শর্তও আমার সত্তায় স্পষ্টভাবে পূর্ণ রয়েছে। কেননা, এদেশে বিদ্যমান প্রত্যেক ধর্মগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো শত্রু সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আমাকে নির্মূল করতে চেয়েছে, আর এ লক্ষ্যে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা তাদের সকল অপচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। কোনো জাতি এখন একথা বলার গৌরব রাখে না যে, তাদের কেউ এই ব্যক্তিকে ধ্বংস করার কোনোরূপ প্রচেষ্টা চালায় নি। তাদের শত প্রচেষ্টার বিপরীতে খোদা-তাআলা আমাকে সম্মান প্রদান করেছেন আর হাজার হাজার মানুষকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন। এটা খোদার সমর্থন নয়তো কি? একথা কে না জানে যে, প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ পন্থায় আমাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্ত তাদের এই অপচেষ্টায় আমি ধ্বংস হই নি বরং দিন দিন উন্নতি লাভ করেছি এমনকি আমার জামাতের লোকসংখ্যা দু'লক্ষের অধিক হয়ে গেছে (তাঁর মৃত্যুর সময় এ সংখ্যা ছিলো প্রায় ৪ লক্ষ- নিঃ সম্পাদক) সুতরাং খোদাতাআলার গোপন হস্ত যদি আমার সমর্থনে কর্যকর না হতো, যদি আমার এই কার্যক্রম কেবল এক মানবীয় পরিকল্পনা হতো তাহলে আমি আমার বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত এসব নানাবিধ তীরের কোনো না কোনোটার লক্ষ্যস্থলে অবশ্যই পরিণত হয়ে কবেই ধ্বংস হয়ে যেতাম, আর আজ আমার কবরের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকতো না। কেননা, যে খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তাকে মারবার অনেক পথ বেরিয়ে আসে। কারণ, স্বয়ং খোদাতাআলা তার শত্রু হয়ে যান। কিন্ত খোদাতাআলা চব্বিশ বছর আগে তাঁর প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী আমাকে এদের সকল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এছাড়া এটা কত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ঐশী সমর্থন যে, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আমার নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্বের যুগে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় সুসংবাদ দিয়েছিলেন আমি তোমাকে সাহায্য করবো, একটি বৃহৎ

দলকে তোমার অনুসারী করে দিব। আর বিরুদ্ধবাদীদের ব্যর্থ করবো। তাই একটু পরিষ্কার হৃদয়ে চিন্তা করে দ্যাখো যে, এটা কত স্পষ্ট ঐশী সমর্থন আর কত প্রকাশ্য একটি নিদর্শন। আকাশের নীচে এমন শক্তি কি কোন মানুষের বা শয়তানের আছে যে, একাকীত্বের যুগে এমন একটি সুসংবাদ দিতে সক্ষম আর তা পূর্ণতাও লাভ করে। আর হাজার হাজার শত্রু মাথাচাড়া দেয় ঠিকই কিন্তু কেউ এই শুভসংবাদকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না।

এরপর চতুর্থ শর্ত ছিল– বিরোধীরা যে সব অভিযোগ উথাপন করেছে সেগুলোর পূর্ণ ও সমীচীন সদুত্তর দেয়া হয়েছে কিনা? এই শর্তটিও পরিষ্কারভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। কেননা, বিরুদ্ধবাদীদের একটা বড় আপত্তি ছিল, প্রতিশ্রুত মসীহ হলেন স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)। তিনিই দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করবেন। সুতরাং তাদের উত্তর দেয়া হয়েছে যে, কুরআন শরীফ দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুবরণ সাব্যস্ত করেছেন, এরপর তিনি যে পুনরায় পৃথিবীতে কখনই আসবেন না একথা সাব্যস্ত হয়। যেমন, খোদাতাআলা তার (ঈসার) নিজের মুখেই এই ঘোষণা করেছেন ঃ (সূরাতুল মায়েদা ঃ ১৮) ---------- পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে এর অর্থ হলো, খোদাতাআলা কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করবেন, তুমি কি শিক্ষা দিয়েছিলে আমাকে এবং আমার মাতাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর এবং আমাদের উপাসনা করবে? তিনি উত্তর দিবেন, 'হে আমার খোদা! আমি যদি এমন কথা বলে থাকি তবে তুমি তো তা জানবেই কারণ, তুমি অদৃশ্য-জ্ঞাতা (আলেমুল গায়ব)। আমি তাদেরকে কেবল সে কথাই বলেছি যা তুমি আমাকে আদেশ করেছিলে, অর্থাৎ, খোদাকে এক-অদ্বিতীয় সমকক্ষহীন আর আমাকে তাঁর রসূল বলে মান্য কর। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অবস্থা অবগত ছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে ছিলাম। তারপর তুমি যখন আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমি তাদের বিষয়ে সাক্ষী। আমার পর তারা কি করেছে আমি তা মোটেও জানি না।

এখন, এই আয়তসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আঃ) উত্তর দিবেন– যতক্ষণ আমি জীবিত ছিলাম, খৃষ্টানরা বিপথগামী হয় নি আর যখন আমি মৃত্যুবরণ করলাম তখন তাদের অবস্থা কি হয়েছে আমি তা জানি না। তাই, একথা যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) এখনও জীবিত তাহলে একই সাথে খৃষ্টানেরা যে এখনও পথভ্রষ্ট হয় নি আর সঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত একথাও মানতে হবে। তাছাড়া, এই আয়াতে নিজ মৃত্যুর পর হযরত ঈসা (আঃ) নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলছেন, হে আমার খোদা! যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করলে তখন থেকে আমি নিজ জাতির অবস্থা জানি না। সুতরাং একথা যদি সত্য বলে মেনে নেয়া হয় যে, তিনি (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করবেন আর মাহদীর সাথে একত্রে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তাহলে নাউযুবিল্লাহ্ কুরআন শরীফের এই আয়াত ভুল সাব্যস্ত হয়। কিম্বা একথা স্বীকার করতে হবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তাআলার সাথে মিথ্যা বলবেন। আর তিনি যে পুনরায় পুথিবীতে আগমন করেছিলেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করেছেন আর মাহদীর সাথে একত্রে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন –এসব কথা গোপন করবেন। সুতরাং যদি কুরআন শরীফে বিশ্বাস রাখ তবে কেবলমাত্র এই একটি আয়াত দ্বারাই সেই সব জল্পনা-কল্পনা মিথ্যা সাব্যস্ত হয় যাতে বলা হয়েছে যে, একজন খুনী মাহদী জন্ম নিবেন আর ঈসা (আঃ) তার সাহায্যকল্পে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস পোষণ করে সে নিঃসন্দেহে কুরআনকে পরিত্যাগ করে। এরপর এখন আমাদের বিরোধীরা সব বিষয়ে পরাভূত হয় তখন বলে, কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। যেমন, আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। আমি জিজ্ঞেস করি, আথম এখন কোথায়? উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মূলকথা ছিল, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর জীবদ্দশায়ই মৃত্যুবরণ করবে। ফলশ্রুতিতে আথম মৃত্যুবরণ করেছে। আর আমি এখনও জীবিত আছি। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি শর্তসাপেক্ষ ছিল অর্থাৎ এতে উল্লেখিত সময়সীমা শর্তযুক্ত ছিল। যখন ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে আথম ভীত হলো তখন সে শর্ত পূর্ণ করেছিল। তাই তাকে বাড়তি কয়েক মাসের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। পরিতাপের বিষয়, এ ধরনের আপত্তি উত্থাপনকারীরা চিন্তা করে দেখে না যে, যেমনটি ইউনুস নবীর পুস্তকে লেখা আছে, ইউনুস নবীর কৃত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে কোনরূপ শর্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হয় নি। প্রকৃত কথা হলো, সতর্কবাণী (ওয়াঈদ) অর্থাৎ এমন ভবিষ্যদ্বাণী যার মাঝে কারও উপর শাস্তি বর্ষণের প্রতিশ্রুতি থাকে এটা চিরকাল খোদার নিকট তওবা বা সদকা খয়রাত বা খোদা-ভীতির শর্তে শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। এগুলো তওবা, ইস্তেগফার, সদকা-খয়রাত আর খোদা–ভীতির কারণে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় বিলম্ব হতে পারে কিম্বা একেবারেই রহিত হতে পারে। তা নাহলে ইউনুস নবী নবীই সাব্যস্ত হতে পারেন না। কেননা, তাঁর সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে। অপরধীকে শাস্তি দেয়ার বিষয়ে খোদার ইচ্ছা – এটা সদকা, খয়রাত আর দোয়া দ্বারাও দূরীভূত হতে পারে আবার কেবল খোদা-ভীতির মাধ্যমেও পরিবর্তিত হতে পারে। সুতরাং ঐশী- শাস্তি সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য কেবল এটুকু যে, আল্লাহ্তাআলা এক ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেন যা তিনি তাঁর কোনো নবীর নিকট প্রকাশ করেছেন। ইচ্ছা কোনো নবীর কাছে ব্যক্ত না করার ক্ষেত্রে সদকা খয়রাত আর দোয়া দ্বারা যদি সেটা দূরীভূত হ'তে পারে তাহলে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেন সেটা দূরীভূত হ'তে পারবে না? এ ধরনের চিন্তা স্পষ্ট অজ্ঞতার পরিচায়ক আর এতে সব নবীর বিরোধিতা হয়। তাছাড়া, কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রূপকও হয়ে থাকে আবার কিছু সংখ্যক অস্বচ্ছ হয়ে থাকে যাদের প্রকৃত তত্ত্ব পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়। আবার একথাও সত্য, কখনো ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ করতে গিয়ে নবীর ইজতেহাদ ভুলও হ'তে পারে– এতে কোনো ক্ষতি নেই। মানবীয় বৈশিষ্ট্য নবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, আমার বারোজন হাওয়ারী স্বর্গে বারোটি সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু একথা সত্য প্রতীয়মান হয় নি। বরং একজন হওয়ারী মুরতাদ হ'য়ে জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে। তিনি (আঃ) বলেছিলেন, এ যুগের মানুষ জীবিত থাকতে থাকতেই আমি পুনরায় আগমন করবো। এ কথাও সাব্যস্ত হয় নি। এছাড়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর আরও কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী ইজতেহাদ ত্রুটিবশতঃ পূর্ণ হতে পারে নি। সংক্ষেপে, এসবই ছিল ইজতেহাদী ভুল। আর আমার ভবিষ্যদ্বাণীর অবস্থা হলো যদি কেউ ধৈর্য ও সততার সঙ্গে শুনতে রাজী থাকে তাহলে এক লক্ষের চেয়েও বেশী ভবিষ্যদ্বাণী আর নিদর্শন আমার সমর্থনে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই হাজার হাজার পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে শিক্ষালাভ না করে একটি অবোধগম্য ভবিষ্যদ্বাণীকে আপত্তির লক্ষস্থলে বানিয়ে হট্টগোল বাঁধানো আর এর দ্বারাই সিদ্ধান্ত প্রদান করা নিতান্তই অবিচার ।

আমি আশা করি এবং পুর্ণ বিশ্বাস রাখি, যদি কোনো ব্যক্তি আমার কাছে এসে চল্লিশ দিনও অবস্থান করে তাহলে সে একটা না একটা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করবে। আমি এখানেই বক্তব্য শেষ করছি আর দৃঢ় বিশ্বাস করি যে, এটুকুই সত্যান্বেষণকারীর জন্য যথেষ্ট।

ওয়াসসালামু আলা মানিত্তাবাল হুদা

লেখক-মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ

('লেকচার লাহোর' পুস্তকের অনুবাদ)

অনুবাদ-মাওলানা আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী

জুমআর খুতবা

রসূলুল্লাহর (সঃ) আনুগত্যেই আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ হয়

[সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীল হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৯ইং, ফযল মসজিদ, লণ্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা আলে ইমরানের ৩২তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

অর্থ ঃ তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার অনুবর্তিতা কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের গোনাহ্‌ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।"

কুরআন শরীফের এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আসলে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ভালবাসা অথবা আল্লাহর ভালবাসা চিনা যায় রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর পায়রবী বা অনুসরণের দ্বারা। এমনি এমনি দাবি করা যে, রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা আছে বা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা আছে এটা নিছক মুখের বুলি। কুরআন করীমের আয়াতটিকে লক্ষ্য করুন কত প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ ভাষায় উক্ত বিষয়-বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। 'ইন কুন্তুম তুহিব্বুনাল্লাহা'- যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে– একথা বলেন নি যে, আমাকেও ভালবাস (বরং বলা হয়েছেঃ) 'ফাত্তাবিয়ূনী'- আমার পায়রবী বা অনুসরণ কর; 'ইউহ্‌বিবকুমুল্লাহু'–আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন। এ আয়াতটিই আজ খুতবার শিরোনাম (কেন্দ্রীয় বিষয়) আর এ প্রসঙ্গে আমি নবী করীম (সঃ)-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বিষয়-বস্তুটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তুলে ধরব। বিষয়-বস্তু সংক্রান্ত তত্ত্ব-তথ্য এতো একত্র হয়ে গেছে যে, তা হয়ত দু'টি খুতবায় বর্ণিত করতে হবে। দেখি, যেভাবে যদ্দুর সম্ভব হয় বর্ণনা করি।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, 'আল্লাহতাআলা তাঁর পরম সৌন্দর্য ও প্রশংসাবলীর মধ্য থেকে কিছু এরূপ বিষয় (তত্ত্ব-তথ্য) আমার নিকট উন্মোচিত করেছেন, যা ইতঃপূর্বে অন্য কারও জন্য করা হয় নি।" অন্য কথায়, আঁ হযরত (সঃ)-কে আল্লাহ্‌ স্বীয় প্রশংসার যে বিষয়-বস্তু নিজে শিখিয়েছেন তা এর আগে দুনিয়াতে অন্য কোনও নবীকে শিখান হয় নি।

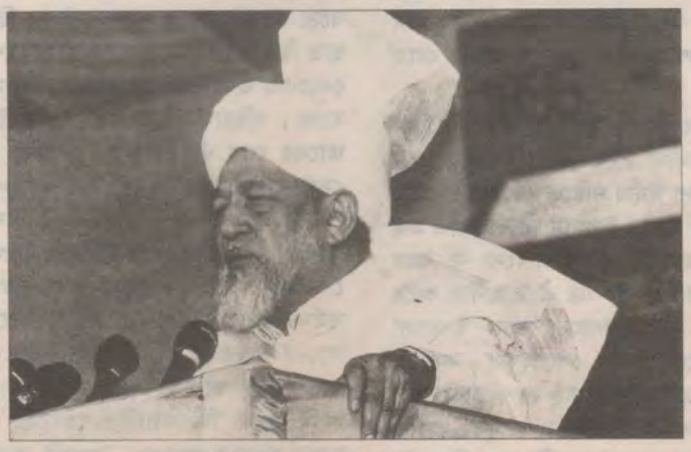

হালালা বিন উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত যে, নবী করীম (সঃ) কোন এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে লক্ষ্য করলেন, সে তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠায় নি। তাই নবী করীম (সঃ) বল্‌লেন যে, 'সে তাড়াহুড়ো করেছে।' অতঃপর, তিনি তাকে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বল্‌লেন, 'তোমাদের মধ্যে যখন কেউ নামায আদায় (বা দোয়া) করতে আরম্ভ করে, সে যেন 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' এবং হাম্‌দ ও সানার দ্বারা আরম্ভ করে। তারপর, তার উচিত নবীর উপরে যেন দুরূদ পাঠায়, এরপর যা ইচ্ছা দোয়া কর" (বুখারী)। স্মরণ রাখা উচিত যে, নিজের ওপর দুরূদ পাঠাবার কোন শখ আঁ হযরত (সঃ)-এর ছিল না, যৎকিঞ্চিৎও না। তিনি দুরূদ পাঠের নির্দেশ এজন্য দিয়েছিলেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর উপরে সাচ্চা দেলে (আন্তরিকভাবে) যে দুরূদ পাঠায়, আল্লাহ্‌ সে দুরূদ তার উপরে পুনরাবৃত্ত করেন। আল্লাহ্‌ ও তাঁর ফিরিশতাগণ যেন ঘোষণা করেন যে, এ সেই ব্যক্তি, যে নবী করীম (সঃ)কে ভালবাসে আর তাই আল্লাহ্‌ও তাকে ভালবাসেন। অতএব, এই দুরূদ প্রেরণ হচ্ছে আমাদের খাতিরেই, এমনটি মনে করবেন না যে, নাউযুবিল্লাহ্‌ হযরত নবী করীম (সঃ)-এর আমাদের দুরূদের প্রয়োজন। প্রয়োজন আমাদেরই, তাঁর প্রতি যেন আমরা দুরূদ পাঠাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেন, "তিনটি বিষয় কারও মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে তার ঈমানের স্বাদ লাভ করবে ঃ (১) আল্লাহ্‌তাআলা ও তাঁর রসূল তার কাছে বাকী সব কিছুর চে' শ্রেয় ও প্রিয়তর হয়ে থাকে, (২) কাউকেও যে সে ভালবাসে তা সে আল্লাহর খাতিরেই ভালবাসে, (৩) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে সে কুফরী থেকে বের হয়ে আসার পরে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এরূপ অপসন্দ করে যেরূপ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে অপসন্দ করে থাকে" (বুখারী)।

আব্দুর রহ্‌মান বিন তালা বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) একদিন ওযূ করছিলেন। এমতাবস্থায় সাহাবারা তাঁর ওযূর পানি তাঁদের হাতে এবং চেহারায় মর্দন করতে লাগলেন।" উল্লেখ্য যে, কোন বুযর্গ ওযূ করাকালীন তাঁর মুখের বা হাতের পানি যদি মানুষ তাদের গায়ে মর্দন করে তাহলে আপাতঃদৃষ্টে তাতে প্রতীয়মান হতে পারে যে, এর প্রকৃত কোনও অর্থ নেই এবং সাধারণতঃ ওরূপ করায় মানুষকে প্রকৃত মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অতএব, লক্ষ্য করুন, আঁ হযরত (সঃ) মা'রেফতের কতো সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁর সাহাবাদেরকে অবলোকন করতেন এবং তাদের তরবীয়ত করতেন! "আঁ হযরত (সঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরূপ তোমরা কী কারণে করছো? এর কারণ কী যে, তোমরা আমার ওযুর পানি নিজেদের হাতে ও চেহারায় মর্দন করছো? সাহাবা-এ-কেরাম উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের মহব্বতের দরুন।' তাতে আঁ হযরত (সঃ) বল্‌লেন, 'যদি তোমারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে সত্যই (প্রকৃতপক্ষে) ভালবেসে থাক এবং চাও, যেন আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলও তোমাদের ভালবাসেন তাহলে সে উদ্দেশ্যে তোমাদের ওরূপ করা উচিত।" এরপর ঐসব বিষয় বর্ণনা করেন যেগুলোতে মৌলিকভাবে রসূলের অনুসরণ এসে যায়– কেবল ভালবাসার দাবি এবং পানি মর্দন আসলে কোন সত্যতার স্বাক্ষর বা পরিচয় বহন করে না। তিনি (সঃ) বলেন, 'যদি চাও আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলও যেন তোমাদেরকে ভালবাসেন তাহলে (১) তোমরা সর্বদা সত্য কথা বলো, (২) যখন তোমাদের কাছে কোন কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখা হয় তখন তাতে খিয়ানত (বিশ্বাস ভঙ্গ) করো না এবং (৩)

নিজেদের প্রতিবেশীর সঙ্গে সর্বদা সদ্ব্যবহার করো (মিশকাত)।" এই ছিল আঁ হযরত (সঃ)-এর তরবীয়ত করার ভঙ্গী। 'আল্লাহুমা সল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলে মুহাম্মাদ, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে, নবী করীম (সঃ) বলেন, "যখন আল্লাহ্ কোন বান্দাকে ভালবাসেন, (এখন এ সেই হাদীস, যেদিকে পূর্বে আমি ইঙ্গিত দিয়েছিলাম–হুযূর) তখন জিব্রীলকে ডেকে তিনি বলেন যে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন। অতএব, তোমরাও তাকে ভালবাস।' সুতরাং জিব্রীলও তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। তারপর জিব্রীল আসমানে অবস্থানকারীদের মাঝে ঘোষণা দেন যে, 'আল্লাহ্তাআলা অমুককে ভালবাসেন। অতএব, তোমরাও তাঁকে ভালবাস।' তাতে আকাশবাসীও তাঁকে ভালবাসতে আরম্ভ করেন। অতপর, ঐ বান্দাকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে 'কবুলিয়ত' (বরণীয় হবার) মর্যাদায় ভূষিত করেন" (বুখারী)। এ বিষয়-বস্তুই মৌলিকভাবে আঁ হযরত (সঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আর এ বিষয়-বস্তুই যা আজ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ক্ষেত্রে (প্রতিচ্ছায়া রূপে) পুনর্ঘটিত হয়। আজ যে মানবহৃদয়ে তাঁর 'মকবুলীয়ত' বা বরণীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সঞ্চার করা হয়েছে তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং তা আল্লাহ্-প্রেম ও রসূল-প্রেমের ফলশ্রুতিতেই বটে।

নবী করীম (সঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সবার চেয়ে শ্রেয় ও প্রিয়তর হয়ে পড়ি" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি ও অন্য সবার চেয়ে শ্রেয় ও প্রিয়তর হয়ে পড়ি" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

আরেক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি যুদ্ধাভিযান-বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি নামাযে কুরআনের অংশ বিশেষের তেলাওয়াত অর্থাৎ 'কেরয়াত' শেষে সূরা ইখলাস (-কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) পাঠ করতেন। সাহাবা যখন অভিযান শেষে ফিরে আসেন তখন আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে ঐ বিষয়টির উল্লেখ করেন। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তার কাছেই এর কারণ জিজ্ঞেস কর।' সুতরাং সাহাবা (রিযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি সূরা ইখলাস এজন্য পাঠ করি যে, এর মাঝে উল্লেখ রয়েছে রহ্মান (-অযাচিত অসীম দানকারী) খোদার গুণাবলীর। সেজন্যই আমার কাছে এর তিলাওয়াত অত্যন্ত প্রিয়।"

খোদা-এ-রহ্মানের উল্লেখ তো অসংখ্য রয়েছে কুরআন করীমে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সূরা ইখলাস এক বিশেষ মর্যাদা রাখে–এরূপ মর্যাদাই বহন করে যে, অপরাপরেও এ সূরাটিকে সর্বদা ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে। তাতে অভিভূত হয়েছে। বড়ো বড়ো কলুষিত মনের ইসলাম বিরোধীরাও এই সূরাটির দিকে ঈর্ষান্বিত বা বিদ্বিষ্ট হয়েছে, কিন্তু প্রশংসা না করে পারে নি। অতএব, এই সূরাটি রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ঐ সাহাবীর কাছে শুধুমাত্র এজন্য প্রিয় বোধ হতো যে, সূরা ইখলাসের ন্যায় 'ইখলাস' (নিষ্ঠা ও সারবত্তা) অন্য কোন সূরাতে প্রকাশ পেতো না। কাজেই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাকে প্রত্যেক নামাযে কুরআনের কিছু অংশ কারয়াতের পরে উক্ত সূরা পাঠে নিষেধ করেন নি। তিনি যদি সূরা নাসও তিলাওয়াত করতেন তবুও 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটি পড়ে নিতেন। এথেকে এ মসলাটিরও সমাধান হয়ে যায় যে, কোন সময় মানুষ যেমন ভুলে যায় এবং পরের সূরা আগে পড়ে ফেলে। এমতাবস্থায় যারা মুল্লাকী মেযাজসম্পন্ন হয়ে থাকে তারা তৎক্ষণাৎ আপত্তি তুলে বলে, 'যেসব আয়াত আগে এসেছে সেগুলো আগেই পাঠ করা উচিত ছিল কিন্তু ওগুলো পরে পাঠ করা হয়েছে।' কিন্তু আমি এ হাদীস থেকেই নির্ণয় করে বলছি যে, চেষ্টা যদিও তাই করা উচিত (অর্থাৎ ক্রমান্বয় ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত) কিন্তু ভুলচুকও হয়ে যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভুলে গিয়ে যদি কেউ পরের সূরা আগে পড়ে ফেলে, তাতে তেমন কোন ক্ষতি নেই। মোটকথা, অভিযানের দলপতির উত্তর শুনে আঁ হযরত (সঃ) সাহাবাকে উদ্দেশ্য করে বলুলেন, 'তাকে জানিয়ে দাও আল্লাহ্তাআলাও তাকে ভালবাসেন" (বুখারী)।

হযরত আবূ দরদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, হযরত দাউদ (আঃ) নিম্নরূপ দোয়া করতেন, "হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার ভালবাসা কামনা করি এবং ঐ সকল লোকের ভালবাসা, যারা তোমাকে ভালবাসে আর এরূপ কাজের ভালবাসা কামনা করি যা আমাকে তোমার ভালবাসায় পৌছে দেয়। হে আমার আল্লাহ্! এমনটি কর যেন তোমার ভালবাসা আমার দৃষ্টিতে আমার প্রাণ, আমার পরিবার-পরিজন এবং ঠান্ডা পানির চেয়েও প্রিয়তর বোধ হয়।" এ সেই দোয়া, যা এর আসল ভাষায় করা উচিত। কেননা, বিনা তরজমা সরাসরি আত্মস্থ মূল ভাষায় দোয়া করাই এক স্বতন্ত্র ব্যাপার বটে। মূল ভাষায় দোয়াটি হলো ঃ "আল্লাহুম্মা আসয়ালুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মান ইউহিব্বুকা ওয়াল আমরাল্লাযী ইউবাল্লেগুনি হুব্বাকা আল্লাহুম্মাজয়াল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়া মিন নাফসী ওয়া আহলী ওয়াল মায়িল বারেদ।" ঠান্ডা পানির উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এই বুঝায় যে, তৃষ্ণায় যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার অবস্থা দাঁড়ায় তখন ঠান্ডা পানি ছাড়া অন্য কোন জিনিস তৃপ্তি দেয় না। যারা কোকাকোলা-প্রিয় তাদেরও এর অভিজ্ঞতা হতে পারে। প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায় ঠান্ডা পানির যে স্বাদ তা সম্পূর্ণই আলাদা। অতএব, 'মিনাল মায়িল বারেদ' এজন্য বলা হয়েছে।

হযরত আব হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, **"যে গুরুত্বপূর্ণ কাজই খোদাতাআলার হামদ ও প্রশংসা ব্যতিরেকে শুরু করা হয় তা আশিসবিহীন ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে থাকে।"** এথেকে আমার নিজের একটি মনোরম ঘটনার কথা স্মরণে এসেছে। সম্প্রতি আমার সন্তান-সন্ততি কর্ণওয়াল বেড়াতে গিয়েছিল। এক সময় আমারও শখ ছিল ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণের। ঐ যুগে খ্রীষ্টানদের বিশেষ বড়ো রকম এক রহস্যময় কৌশল ছিল। বাইরে থেকে আগত যে সব ছাত্র ছিল তাদেরকে ফুসলাবার উদ্দেশ্যে ভাল ভাল পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বেড়াবার জন্য এক এক সপ্তাহ বিনা মূল্যে থাকা-খাওয়ার আমন্ত্রণ দেয়া হতো। বহিরাগত ছাত্রদের যেহেতু টাকা-কড়ির অভাব হতো কাজেই তাদের আর কী বা চাই। সুতরাং একটি আমন্ত্রণ আমিও পেলাম। সেখানকার একজন খ্রীষ্টান মহিলা দাওয়াত দিয়েছিলেন। এক সপ্তাহব্যাপী থাকা-খাওয়ার সবই বিনা মূল্যে ব্যবস্থা থাকবে। আমার আবার তখন আর কী চাই, আমি তৎক্ষণাৎ তাতে সায় দিলাম এবং চলে গেলাম। আমি তাদের সেয়ানা সুচতুর কৌশলগুলোর কথা বলছি। বর্তমানকালেও যেসব ছাত্রের ঐ ধরনের জালে ফাঁসাবার উপক্রম ঘটে তাদের উচিত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার। আমার স্মরণ আছে, যখন খাওয়া শুরু হবে তখন ঐ মহিলা চাপাকণ্ঠে কিছু পাঠ করলেন। আর আমি তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করলাম। সে মহিলা তাতে আমাকে বলুলেন, "আপনি স্বচ্ছন্দে শুরু করে দিন, আপত্তি নেই। আমাদের তো নির্দেশ আছে যে, যে আহার প্রার্থনা ব্যতিরেকে করা হয় তা কল্যাণজনক হয় না। আপনার অন্তরে সে বিষয়টি অনুপস্থিত। আপত্তি নেই, আপনি খেতে থাকুন। তাতে আমাদের কী যায় আসে।" আমি তাকে বললাম, "আপনাদের বিধানে কি শুধুমাত্র খাবারই উল্লেখ

রয়েছে?! ইসলামের বিধানে তো আছে প্রত্যেক কাজ, যা 'বিসমিল্লাহ্' ব্যতিরেকে করা হয় তা অকল্যাণপ্রসূ হয়। কোট বা জুতো পরার সময়ও আমরা 'বিসমিল্লাহ' পড়ে থাকি। বেচারী এতো লজ্জিত হলো যে, তার ধারণা ছিল, এই বাহানায় সে তার প্রিয়জনদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরাবে এবং খ্রীষ্টধর্মের কাছে ভিড়াবে। কিন্তু তার যে এক জামাতাকেও সেখানে সে ডেকে এনেছিল, সে যখন আমার কথাগুলো শুনলো তাতে তার অন্তর আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হলো। তবে আমি বুঝে গিয়েছিলাম তার জামাতাকে প্রভাবান্বিত করি, তা সে মহিলা পসন্দ করবেন না। আমি দৈনিক ভ্রমণের অজুহাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে দূর-দূর পর্যন্ত সমুদ্রের কিনারায় পৌছে যেতাম এবং সৈকতে বসে বসে তাকে বলতাম, 'দেখ ইসলামের এই এই সৌন্দর্য রয়েছে।' সে অত্যন্ত আগ্রহভরে শুনতো। অবশ্য ঐ মহিলা জানতে পারতো না আমি তার জামাতার সাথে কী কথাবার্তা বলি। সে (মহিলা) কেবল এটুকুই মনে করতো যে, সে আমাদের সঙ্গে সফল কৌশল খাটাচ্ছে। যাহোক, খরচপাতি তো সে বহন করছিলই, ওয়াদাবদ্ধ ছিল সে খানাপিনা ইত্যাদির ব্যাপারে। ভাল খাবার ছিল নিসন্দেহে। যা বিনা মূল্যে আমরা পেতাম। আর বিনামূল্যে একজন মুসলমানও হয়ে গেল। ঐ যুবক যে মহিলার জামাতা ছিল সে,– আমার স্মরণ আছে, শেষ (বিদায়ের) দিন আমাকে বল্লো, "আল্লাহ্ ভাল জানেন আমি আবারও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব কিনা। কিন্তু আজ আমি তোমার হাতে একটি অঙ্গীকার করছি যে, তুমি যা কিছু বর্ণনা করেছ অবিকল তাই আমার ধর্মমত। খ্রীষ্টধর্মের প্রশ্ন নেই, তা সবই মিথ্যে। আসল ওটাই যে ইসলাম তুমি আমার কাছে তুলে ধরেছ। প্রকাশ্যে ইসলামে প্রবেশ করার সৌভাগ্য ও তৌফীক আমি পাই বা না পাই, তুমি সাক্ষী থেকো যে, আমি মুসলমানের অবস্থায় আছি এবং এ অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।" আল্লাহ্তাআলা তাকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করুন। ঐ ব্যক্তির জন্য আমি সব সময় দোয়া করি– যখন তার কথা স্মরণ হয়। তার অন্তরে সত্যতা ও নিষ্ঠা ছিল। আল্লাহ্ পড়ে উত্তম জানেন তার কী অবস্থা হলো। কিন্তু সে এমন ছিল যে, ইসলামের ভালবাসা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল।

আমার ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে, নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসরণ করা এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় করে দেয়।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদা আঁ হযরত (সঃ) আমাদের কাছে আসলেন এবং বল্লেন, 'জান্নাতের বাগানগুলোতে চরার চেষ্টা কর।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতের বাগানগুলো বলতে কী বুঝায়? তিনি (সঃ) বল্লেন, 'আল্লাহ্কে স্মরণ করার আসরসমূহ হলো জান্নাতের বাগান।' তিনি আরও বললেন, 'সকালে ও সন্ধ্যায় বিশেষভাবে আল্লাহ্তাআলার যিক্র করো। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে তার কদর মর্যাদা কী তা জানতে চায় সে যেন লক্ষ্য করে আল্লাহ্তাআলার সম্পর্কে তার কাছে সে কী রকম কদর ও মর্যাদা পোষণ করে। আল্লাহ্তাআলা ওরূপই তাকে কদর করেন, যেরূপ কদর ও মর্যাদা আল্লাহ্তাআলার জন্য সে তার অন্তরে পোষণ করে থাকে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস 'তিরমিযী, কিতাবুদ্ দায়াওয়াত' থেকে গৃহীত হয়েছে-তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে বলতে শুনেছেন, "উৎকৃষ্ট যিক্র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং উৎকৃষ্ট দোয়া হলো 'আল্হামদু লিল্লাহ্।" এই সঙ্গে ঐ হাদীসটিও স্মরণ পড়ে। একবার আঁ হযরত (সঃ) হযরত আবূ হুরায়রাকে বল্লেন, "মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ফাকাদ দাখালাল জান্নাতা– যে ব্যক্তিই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।" তিনি (রাঃ) তা মদীনার ওলি-গলিতে ঘোষণা দিতে আরম্ভ করলেন। হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত তেজস্বী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সে অবস্থায় তাঁকে ধরে বল্লেন, তুমি এ কী ঘোষণা করছো? সাবধান! ওভাবে ঘোষণা করবে না। আবূ হুরায়রা বল্লেন, আমাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাকাদ দাখালাল জান্নাহ্।' ওভাবেই তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন হযরত উমর রসূলুল্লাহ্র (সঃ)-এর কাছে এবং বল্লেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি তাকে একথা বলেছেন? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বল্লেন, হ্যাঁ! আমি তাকে তা বলেছি। ছেড়ে দাও বেচারাকে। এটা ঠিক যে, ঘোষণা করায় ভুল বুঝাবুঝির কারণও হতে পারে। লোকে মনে করবে কোন আমলের প্রয়োজন নেই। কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল আর সোজা জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ কর।

এখন রয়েছে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহ, যা বেশ দীর্ঘ। সেজন্য আমি দুই অংশে ভাগ করে নিয়েছি। যদি বেঁচে যায়, তাহলে অপর অংশটি আগামী খুতবায় বর্ণনা করা হবে। তিনি (আঃ) বলেন ঃ "আমি সত্য সত্য বলছি যে, কোন ব্যক্তি পুণ্যবান ও খোদাতাআলার সন্তোষপ্রাপ্ত বলে সাব্যস্ত হতে পারে না এবং পুরস্কার ও বরকতসমূহ এবং ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং কাশ্ফ ও ইলহামের দ্বারা ভূষিত হতে পারে না, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মশুদ্ধির দ্বারা পাওয়া যায়।" যখন নফস ও আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন কী পাওয়া যায়? পুরস্কার ও বরকতসমূহ এবং ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং কাশ্ফ ও ইলহাম– এই সব পাওয়া যায়। যতক্ষণ না সে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর অনুবর্তিতায় আত্মহারা হয়ে যায়। সেজন্য **কাশ্ফ ও ইলহামের আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং অনুবর্তিতার চিন্তায় আত্মমগ্ন হও। যদি আঁ হযরত (সঃ)কে অনুসরণ করতে পার তাহলে এর ফলশ্রুতিতে আপনা-আপনি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে কাশ্ফ ও ইলহাম ইত্যাদি পাওয়া যাবে।** এর প্রমাণ স্বয়ং খোদাতাআলার কালাম থেকেই জানা যায় ঃ 'কুল্ ইন কুন্তুম তুহিব্বূনাল্লাহা ফাত্তাবিয়ূনী ইউহ্বিব কুমুল্লাহ্'। একথা বলেন নি, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন, বরং বলেছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে তাঁর রসূলের অনুবর্তিতা কর তবেই কিনা আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' খোদাতাআলার উক্ত দাবীর ফলিত ও জীবন্ত প্রমাণ হচ্ছি আমি নিজে। (তিনি বলছেন,) খোদাতাআলার মাহবুব বা প্রিয়দের এবং ওলি বা বন্ধুদের সম্পর্কে কুরআন করীমে নির্ধারিত নিদর্শনাবলীর দ্বারা আমাকে সনাক্ত কর।" তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ্তাআলা কাউকেও ভালবাসার জন্য এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, ওরূপ ব্যক্তি যেন আঁ হযরত (সঃ)-এর পায়রবী (অনুবর্তিতা) করে। সুতরাং আমার ইহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে, নিষ্ঠাপূর্ণ অন্তরে আঁ হযরত (সঃ)-এর অনুসরণ করা এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় করে দেয়। তখন ওরূপ ব্যক্তি অন্য সব কিছু থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার অন্তঃকরণ আল্লাহ্র দিকেই ঝুঁকে যায়, এবং তার অনুরাগ ও শখ কেবল খোদাতাআলার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থেকে যায়। তখন 'মহব্বতে-ইলাহী' (ঐশী প্রেম)-এর এক খাস তজল্লি (জ্যোতির্বিকাশ) তার ওপরে পতিত হয় এবং তাকে ঐশী প্রেম ও ভালবাসার এক পরিপূর্ণ রূপদান ক'রে শক্তিশালী আকর্ষণের দ্বারা নিজের দিকে টেনে নেয়। তখন প্রবৃত্তিমূলক বাসনা-কামনার ওপর সে প্রবল হয় এবং তার সাহায্য ও সমর্থনে সকল দিক থেকে খোদাতাআলার অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ নিদর্শনাবলীর আকারে প্রকাশিত হয়। ইহা তো আমরা চেষ্টা-সাধনার একটি পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছি। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি এরূপও হয়ে থাকেন, যাদের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনার আদৌ কোন দখল থাকে না, বরং তাদের মাতৃগর্ভেই এরূপ গঠনাকৃতি প্রকাশিত হয় যে, চেষ্টা-সাধনা ও মুজাহাদার মাধ্যম ব্যতিরেকে স্বভাবতই (প্রাকৃতিক ধারায়) খোদাকে তারা ভালবেসে থাকেন।"

এ বিষয়টি খুব ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, গর্ভাবস্থায় বরং তার

আগেও (কুরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত) ঐ দোয়াগুলো করতে থাকা উচিত যে, এর ফলশ্রুতিতে ছেলে বা মেয়ে যা-ই আল্লাহ্ দান করেন তা যেন খোদার প্রেমিক হয়। এই সব দোয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের শিখিয়েছেন যা গর্ভসঞ্চারের আগে এবং গর্ভাবস্থায় করতে হয়। এবং তিনি (সঃ) বলেছেন, এর প্রভাব পড়ে থাকে শিশুর ওপর। উঁচু আওয়াজে তোমরা যে কথা-বার্তা বলে থাক, গর্ভস্থিত বাচ্চার ওপর সেগুলোর প্রভাব পড়ে। এখন বৈজ্ঞানিকেরাও এ বিষয়টি গবেষণায় জেনে নিয়েছেন, যা আঁ হযরত (সঃ) চৌদ্দশ' বছর আগে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁরা এক্স-রে ইত্যাদির দ্বারা ওরূপ (উঁচু আওয়াজ) করিয়ে দেখেছেন যে, বাচ্চা তাতে কেঁপে ওঠে। আর এই জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, বাচ্চা যখন (মায়ের) পেটে থাকে তখন মায়ের সাথে আদর ও স্নেহমাখা এবং ভাল কথা বলা উচিত। এর প্রভাব পড়ে থাকে শিশুর অন্তরে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এ তো আমরা চেষ্টা-সাধনার একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছি কতক ব্যক্তি এরূপও হয়ে থাকেন যাদের ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে চেষ্টা-সাধনা ও মুজাহাদার কোন দখল-আমল থাকে না। বরং মাতৃগর্ভেই তাদের এরূপ এক গঠনাকৃতি বিদ্যমান পাওয়া যায়।"

মাতৃগর্ভে (শিশুর) যে গঠনাকৃতি হয়ে থাকে তা ঐসব বিষয়ের দরুনই হয়ে থাকে যা আমি বর্ণনা করে এসেছি। তা এজন্যই হয়ে থাকে। তবে প্রত্যেক মানব শিশু (প্রাকৃতিক) স্বভাবেই জন্মলাভ করে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক স্বভাবের ওপর যদি আল্লাহ্তাআলার পরম ভালবাসা তার হৃদয়ে উদ্বেলিত হয় তাহলে তা সেই বিষয় যা উল্লেখিত উপায়েই সৃষ্টি হয়, যা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বর্ণনা করছেন। অতঃপর, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "প্রাকৃতিক ধারায় স্বভাবতই খোদাকে তারা ভালবেসে থাকেন এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে তাদের এরূপ রূহানী সম্পর্ক হয়ে যায় যে, এর চেয়ে অধিক সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নয়। তারপর যতই সময় অতিবাহিত হয়, ঐ অভ্যন্তরীণ ঐশীপ্রেমাগ্নি ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে আর সেই সাথে রসূল-প্রেমাগ্নিও প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। আর এইসব যাবতীয় ব্যাপারে খোদা তাদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। অতঃপর যখন ঐ প্রেমাগ্নি চূড়ান্ত এক মার্গে পৌছে যায় তখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে ও ব্যথা-বেদনাভরে কামনা করেন খোদাতাআলার জালাল (প্রতাপ) যেন দুনিয়ার ওপর প্রকাশিত হয়; আর তাতেই তাদের সুখ ও আনন্দ নিহিত এবং ওটাই তাদের চরম ও পরম লক্ষ্য ও কাম্য হয়ে থাকে।"

এখন এরূপ এই সময় যখন আহমদীয়া মুসলিম জামাত খোদার ফযলে বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত তবলীগ করছে। (নবদীক্ষিত) এক কোটির দৃশ্য তো আপনারা অবলোকন করেছেন। **দোয়া করুন আগামী বছর আল্লাহ্ যেন আপনাদেরকে দুই কোটির অধিক লোকের দৃশ্যও দেখান।** কিন্তু মুশকিল এই যে, এই এক কোটিও তাদের হযম হচ্ছে না। অত্যন্ত মুশকিলে পড়ে গেছে তারা। ফলে প্রতিশোধস্পৃহার আগুনে দগ্ধ হয়ে তারা আহমদীদের ওপরও যুলুম অত্যাচার চালাচ্ছে। সম্ভাব্য প্রত্যেক উপায়ে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাতে কোনও ছুঁতো ধরে আহমদীদেরকে কষ্ট দেয়া যায়। এখন যে যুগ এসেছে (পাকিস্তানে) তাতে যারা এখন এডমিনিস্ট্রেটর আছেন তাদের অন্তরের সত্যতা ও সাধুতা প্রকৃতপক্ষে চেনা যাবে এ বিষয়ের দ্বারা যে, এখনও যদি আহমদীদেরকে জবরদস্তি এই অপরাধে কোর্টে পাঠানো হয় যে, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পায়রবী করে এবং তারা সর্বাবস্থায় তা করে যেতে থাকবে, দুনিয়ার কোনও শক্তি তা থেকে তাদের বিরত রাখতে পারে না, পারবে না। সেজন্য আগামী দিনগুলোকে আমি খুব সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছি। যদি তাঁরা তাঁদের বিবৃতিগুলোতে সত্য হয়ে থাকেন তাহলে আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ্তাআলা আমাদের আহমদীদেরকে অবস্থা ও পরিস্থিতি শুধরিয়ে সত্য সাব্যস্ত করবেন। যখন অবস্থা শুধরাবে এবং ভাল হয়ে যাবে, তখন আর মিথ্যা বলে বলে তাদের এখানে (লণ্ডনে) আসার প্রয়োজন নেই। শোকর করুন, (যখন) অবস্থা ভাল হয়ে যাবে, তখন আপনারা এখানে আসার জন্য দোয়া করার পরিবর্তে এই দোয়া করুন আমি যেন ওখানে চলে যাই। এ-ও একটি হিকমতের কথা। অতএব, প্রমাণিত হয়ে যাক, আহমদীদের কোনও পার্থিব লোভ-লিপ্সা ছিল না, বরং ইমামের নিকটে হবার শখ ছিল। যা কিছু খোদাতাআলা পার্থিব দিক দিয়ে ফযল করেছেন তা স্বতন্ত্র, তা হয়ে গেছে। আগামীতে ঐ ফযল (ঐশী কৃপা) অধিকতর শান ও মর্যাদায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। রাবওয়াবাসীদের চিল্লা-চিৎকার ও আহাযারীও শোনা হবে, গৃহীত হবে। খোদা তাদের দিন-কালও পাল্টে দিন এবং আমাদের সবাইকে পূর্ণ মর্যাদাসহ রাবওয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। সুতরাং এই যে তবলীগের দ্বারা আমরা বিস্তার লাভ করি এতে কখনও এটা বুঝায় না বা এর উদ্দেশ্য এ নয়– যাতে সংখ্যাগত বরকত হয়। সংখ্যাগত বরকত তো পাকিস্তানেই। এর চেয়ে বেশি মুসলমান রয়েছে। সংখ্যার কোন মূল্য নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সঙ্গে হকীকত (মৌলিক ও বাস্তব সত্য) যুক্ত হয়। সেজন্য এই নিয়্যত ও আকাঙ্ক্ষার সাথে তবলীগ করুন যে, আল্লাহ্তাআলার জালাল (প্রতাপ) যেন পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। "এবং এর মাঝেই তাদের সুখানুভূতি নিহিত এবং এটাই তাদের পরম লক্ষ্য ও কাম্য হয়ে থাকে। তাদের জন্য পৃথিবীতে খোদাতাআলার নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে আর কারও জন্য খোদাতাআলা তাঁর মহান নিদর্শন প্রকাশ করেন না এবং আর কাউকে ভবিষ্যত কালের মহান সংবাদসমূহ দান করেন না কিন্তু একমাত্র তাদেরকেই করেন যারা উক্ত (ধারায়) আল্লাহ্-প্রেম ও রসূল-প্রেমে বিভোর হয়ে থাকেন। হক্কতাআলার তৌহীদ ও জালাল প্রকাশের তারা এতো অভিলাষী হয়ে থাকেন, যেমন তিনি নিজে। এ বিষয়টি কেবল তাদের সাথেই সম্পৃক্ত।"

তারপর, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "খোদাতাআলাকে ভালবাসার দ্বারা কী বুঝায়? এই যে, নিজের মাতা-পিতা, স্ত্রী, সন্তান ও স্বীয় সত্তা এবং প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের ওপর আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টিকেই যেন অগ্রগণ্য করা হয়। সুতরাং কুরআন করীমে এসেছে, "ফায্কুরুল্লাহা কাযিক্রিকুম আবায়াকুম আও আশাদ্দা যিক্রা–'আল্লাহ্তাআলাকে তোমরা সেভাবে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাদের স্মরণ করে থাক, বরং তার চেয়েও অধিক একাগ্রচিত্তে।" এখানে তিনি (আঃ) আল্লাহ্কে ভালবাসবার এক স্বচ্ছ ব্যবস্থা তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন, "এস্থলে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন করীম এ শিক্ষা দেয় নি যে, খোদাকে তোমরা পিতা বলো। কেননা, খ্রীষ্টানরা পিতা বলে পদস্খলিত হয়েছে। আর পিতা বলার দরুন তারা হযরত ঈসাকে প্রকারান্তরে সত্যি সত্যি খোদার পুত্র বলে মনে করে বসেছে। খোদাকে পিতা বলবার শিক্ষা কুরআন করীম এ জন্যই দেয় নি যাতে নাসারাদের ন্যায় তোমরা ধোঁকায় না পড়। অতএব, খোদাকে পিতা বলে যেন না ডাক। যদি কেউ বলে, 'তবে কি পিতার চে' কম পর্যায়ের ভালবাসা?' এই আপত্তি নিরসনের জন্য বলা হয়েছে, 'আও আশাদ্দাযিকরা'–পিতাদের স্মরণ করার চেয়ে বেশী স্মরণ করো।" 'আও আশাদ্দা যিক্রা' বাক্যটিতে এটাও বুঝায় না যে, হয় এটা কর, না হয় ওটা। বরং এ বাক-ধারাটির অর্থ হচ্ছে, পিতাদের যেমন তোমরা ভালবাস, তেমনি খোদাকে ভালবাস বরং তার চেয়ে অধিক ভালবাস এবং অধিক আত্মবিভোর হয়ে খোদাকে স্মরণ কর। সুতরাং হযরত দাউদের যে দোয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) শিখিয়েছেন তাতেও ঐ রকম ভালবাসার উল্লেখ রয়েছে।

যেহেতু আর পাঁচ মিনিট বাকী আছে তারপর নামাযও পড়তে হবে, কাজেই এ সংক্রান্ত অবশিষ্ট বিষয়-বস্তু আগামী খুতবার জন্য তুলে রাখলাম।

(অডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

আহমদী শহীদগণের স্মরণে

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৮ মে, ১৯৯৯ইং, ফযল মসজিদ, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৫৪ ও ১৫৫ নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত করেন।

"ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানুস্ তাঈনূ বিস সাবরে ওয়াস্ সালাতে ইন্নাল্লাহা মাআস্ সবেরীন, ওয়ালা তাকূলূ লেমাইঁ ইউকতালু ফী সাবিলিল্লাহে আমওয়াত বাল আহইয়াউন ওয়ালাকিল্লা তাশউরূন।"

অর্থাৎ হে লোক সকল যারা ঈমান এনেছো! ধৈর্য ও নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করে তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। যারা আল্লাহ্র রাস্তায় মারা যায় তাদের মৃত বল না বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।

শাহাদতের যে দীর্ঘ বিবরণ চলছে আজও উহার বিবরণ চলবে। এবং আরো অনেক দিন এই বিবরণ চলবে। আজকে যে সকল শহীদের ঘটনা বলবো তাদেরকে শত্রুরা সরাসরি হত্যা করে নি বরং তারা আল্লাহ্র রাস্তায় সেবা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং এ দিক হতে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তাদের শহীদগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে তালিকা প্রস্তুত করেছি উহাতে প্রথম নাম রয়েছে মির্যা আহমদ শফী সাহেবের ভাই **মির্যা মুনাওয়ার আহমদ মরহুম** সাহেবের। গত খুৎবায় এ ব্যাপারে স্মরণ শক্তির ভুলের কারণে অথবা অসাবধানতার কারণে একটি বিষয় ভুল বলে ফেলেছি। আমি উহার সংশোধন করতে চাই। মরহুম মির্যা আহমদ শফী সাহেবের পুত্র মির্যা মসীহ্ আহমদ জার্মানী হতে সংশোধনী করিয়েছেন। অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার কিন্তু যেহেতু খুৎবায় বলা হয়েছে তাই ইহার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। মরহুমা আমাতুর রহমান সাহেবার সাথে যে মেয়েটি থাকতো তার নাম আমি ভুলবশতঃ আমাতুল বাসেত বলেছি। আসলে ঐ মেয়েটির নাম আমাতুল কাইউম। আমাতুল কাইউম বিবাহিতা ও বর্তমানে সারগোধাতে বসবাস করছেন। আমাতুল বাসেত সাহেবা লন্ডনে থাকেন। তিনি ফযল এবং শীলার মাতা। এই সংশোধনীর পর আমি শহীদদের উল্লেখ করছি।

প্রথমে যার উল্লেখ করছি তিনি হলেন **শাহযাদা আব্দুল মজীদ সাহেব**। তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ সনে শাহাদত বরণ করেন। তাকে তেহরানে দাফন করা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১২ই জুলাই, ১৯২৪ সনে শাহযাদা আব্দুল মজীদ সাহেব লুধয়ানভীকে ইরানে আহমদী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। তার সাথে মৌলভী যহুর হোসেন সাহেব ও মুহাম্মদ আমীন খান সাহেব ছিলেন। যাদেরকে বুখারাতে আহমদীয়তের পয়গাম পৌছানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। হযরত শাহযাদা সাহেব যিনি এই প্রতিনিধিদলের আমীর ছিলেন তিনি তাদের সাথীদের নিয়ে ১৬ই অক্টোবর, ১৯২৪ সনে ইরানের বিখ্যাত শহর মাশহাদে পৌছান। পাঁচ ছয় দিন পর মাশহাদ হতে তেহরান পৌছান এবং সেখানে নতুন দারুত তবলীগ (তবলীগ কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত করেন।

হযরত শাহযাদা আব্দুল মজীদ সাহেব বৃদ্ধ বুযর্গ ও পুরানো সাহাবী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং নিজ খরচে এসেছিলেন। কিন্তু এখানে আসার পর টাকা শেষ হয়ে যায়। দেশে কোন সম্পত্তি ছিল না। কেন্দ্র হতেও তাঁকে সব সময় আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছিল না। তিনি সাধারণ চাটাই ও সাধারণ বিছানাতে ঘুমাতেন। অনেকে সময় আর্থিক অনটনের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছাতো যে কাপড় ধোয়ার জন্য সাবান কেনার পয়সাও থাকতো না। এতদ্সত্ত্বেও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তিনি সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ সনে তিনি তেহরানে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

তাঁর মৃত্যুতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, "শাহাযাদা আব্দুল মজীদ সাহেব আফগানিস্তানের রাজ পরিবারের সদস্য ছিলেন। তিনি শাহ সুজার বংশধর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ও খোদার উপর ভরসাকারী ছিলেন। আমি যখন ঘোষণা দিলাম যে, তবলীগের জন্য এমন মুজাহিদদের প্রয়োজন যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে তখন তিনি নিজেকে পেশ করেন। ঐ সময়ে তার নিকট অল্প টাকা পয়সা ছিল। তিনি নিজেদের ঘর বিক্রি করে নিজের অংশ রেখে অন্যান্যদের অংশ দিয়ে দেন। এরপর আমাকে লিখেন যে, আমি নিজ খরচে যাবো। সে সময়ে আমি তাঁকে পাঠাতে পারি নি। কিছু সময়ের পর যখন তাঁকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় তখন তাঁর নিকট অর্থ ছিল না। কিন্তু তিনি বলেন নি যে, তাঁর কাছে অর্থ নেই। তিনি ভারতের বাইরে কখনও যান নি। ঐ দেশে (ইরানে) তাঁর পরিচিত কেউ ছিল না। তাঁর নিকট অর্থ ছিল না অথচ একথাটি তিনি কখনও বলেন নি। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন ঐ অবস্থাতেই ছিলেন। ওখান হতেও তিনি তাঁর অবস্থা সম্বন্ধেও কখনও জানান নি। জানি না তিনি কীভাবে চলতেন। পরবর্তীতে আমি এ ব্যাপারে অবগত হই।" হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, একবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর চিঠি আসে না। পরবর্তীতে যখন চিঠি আসলো তাতে তিনি জানালেন টিকিটের পয়সা ছিল না, তাই চিঠি লিখতে পারি নি। সে সময়ে এই ভেবে মনে মনে কষ্ট পেলাম যে তার যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে, সেখানে খরচের জন্য আপনার কাছে অর্থ আছে কিনা। এরপর তাঁর চলার জন্য আমি সামান্য অর্থ দিতে নির্দেশ দিই। সেখানকার লোকদের উপর তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবের যে গভীর ছাপ ছিল তা তাঁর পত্রের মাধ্যমে জানতে পারা যায়। পরশু বা তার আগের দিন খবর পাওয়া গেছে যে, তিনি প্রথম রমযানুল মুবারকে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি দশদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি গায়ে জ্বরে ভুগছিলেন। শেষ দিনে তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হন। ডাক্তার ডাকা হলে বলা হয় যে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে চল। পরবর্তী দিন তাকে (হাসপাতালে) নিয়ে যাবার ছিল যে, ইতোমধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সেবা শশ্রূষাকারী সারা রাত জেগে থাকেন। সেবা শশ্রূষাকারী সেহরীর সময় ফজরের নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সে দুপুর বারোটার সময়

ঘুম থেকে জেগে দেখে যে, তিনি মারা গেছেন। হযরত শাহযাদা আব্দুল মজীদ সাহেবকে তেহরানের দক্ষিণে একটি ছোট কবরস্থানে দাফন করা হয়। ১৯৫৩ পর্যন্ত সেখানে তাঁর কবর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এর পর কবরস্থানের মাটি সমান করে সেখানে ইমারত নির্মাণ করা হয়।

দ্বিতীয় মুবাল্লেগ যার কথা বলতে যাচ্ছি তাঁর নাম হলো মুহাম্মদ রফিক সাহেব কাশগর। ১৯৩৯ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং কাশগরে তাঁকে দাফন করা হয়। মুকাররম মৌলভী মুহাম্মদ রফিক সাহেব জেলা শাহপুরের চাঁচড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাহরীকে জাদীদের দশ নম্বর দফা অনুযায়ী নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তাহ্‌রীকে জাদীদের দশ নম্বর দফা হলো সফর খরচ সঙ্গে নিয়ে (তবলীগের জন্য) অন্যদেশে যেতে হবে। সুতরাং তিনি সফর খরচ নিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন। সেখানে পৌছে তিনি ব্যবসায় করে তবলীগী কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। মৌলভী সাহেব কাশগর যাবার নিয়্যত করলেন। ১৯৩৮ সনে তিনি রাজা আদালত খানের সাথে কাশ্মীর পৌছুলেন। রাজা আদালত খান সাহেব পাসপোর্ট পান নি কিন্তু মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ রফিক সাহেব পাসপোর্ট পেয়ে গেলেন। তাঁকে আরো কিছু দিন শ্রীনগরে থেকে যেতে হলো। এ সুযোগে তিনি চীনের তুরঘিস্তানের ভাষা অনেকটাই রপ্ত করে নিলেন। গিলগিট হতে কাশগরের সফর অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। রাস্তায় আঠারো হাজার দুই শ' ফুট উঁচু পাহাড় ও বরফের গ্লিশিয়ারের (বড় বড় বরফের পাহাড়) বাধা ছিল। মরহুম পদব্রজেই যাত্রা করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু গিলগিটের জামাত তাঁকে একটি ঘোড়া কিনে দিল। তিনি দুই মাসে নিরাপদে কাশগর পৌছান। কাশগরে পৌছে তিনি দরজীর কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে কাপড়ের দোকান দেন। ঐ সময়ে কাশগর রাশিয়ার তুরঘিস্তানের অন্তর্গত ছিল। সরকার কিছু তাকে নযরবন্দী করে রা"খ তথাপি মরহুম নিষ্ঠার সাথে তবলীগী কর্মকান্ড চালিয়ে যান। সুতরাং তাঁর তবলীগ দ্বারা কাশগরের সলুখ গ্রামের হাজী আল মুহাম্মদ সাহেব ও হাজী জনুদুল্লাহ্ সাহেব পরিবার সহ আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। হাজী জনুদুল্লাহ্ সাহেবের পরিবার আল্লাহ্‌র ফযলে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা অনেক উন্নতি করেছে। এই পরিবারটি পরবর্তীতে প্রায় বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হিন্দুস্থানে পৌছায়। তিন বছরের মাথায় মুহাম্মদ রফিক সাহেব 'ইস্তেসকা' (এই রোগে রোগী বেশী বেশী পানি খায়) রোগের আক্রান্ত হন। এই রোগ যকৃত নষ্ট হবার কারণে হয়। তিনি এই রোগেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ গিলগিট হতে মির্যা মুআয্‌যেম বেগ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-কে প্রদান করেন। মরহুম কাশগরে বিবাহ করেন। মারা যাবার সময় স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে যান। মুহাম্মদ রফিক সাহেবের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, "আদালত খান সাহেব এক যুবককে তাহরীক করেন এবং সে তাতে রাযী হয়ে যান। যদিও আদালত খান সাহেব মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা তার বীজকে নষ্ট করেন নি। বরং আরেকজন যাকে তিনি সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আহমদীয়তের পতাকাকে উচ্চতর করতে লাগলেন। তিনি পূর্ব দিকের শহর কাশগরে পৌছে তবলীগ করতে শুরু করেন। এর ফলে আল্লাহ্‌তাআলা ওখানকার এক ব্যক্তিকে আহমদীয়ত গ্রহণ করার তৌফীক দান করেন। তাঁর নাম হাজী জনুদুল্লাহ্ সাহেব। তাঁর তবলীগের কারণে তিনি কাদিয়ানে আসেন ও যাচাই করে আহমদীয়ত কবুল করেন। কিছু দিন পর তার মাতা ও স্ত্রী আহমদীয়ত কবুল করেন। বর্তমানে তারা কাদিয়ানে আছেন। যাই হোক আদালত খানের কুরবানী বিফলে যায় নি বরং ইহা ঐ এলাকায় আহমদীয়তের বিস্তারের কারণ হয়ে যায় (তারিখে আহমদীয়ত, পঞ্চম খন্ড)।

পরবর্তী মুজাহেদ, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মির্যা আহমদ শহীদের সাথে উল্লেখ করেছিলাম, তাঁর পরিচিতি এই রূপ। মির্যা মুনাওওয়ার আহমদ সাহেব মরহুম ১৯৪৬ সনের আগস্ট মাসের শেষ দিকে আমেরিকায় চলে যান। শিকাগোতে এক মাস থাকার পর তাকে পিটাস্‌বার্গ হালকায় প্রেরণ করা হয়। শুরুতে এই হালকাটি বালটিমোর হতে কারডিটন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্লিউ ল্যান্ড ও ম্যানগাস টাউনও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সব জামাতে তিনি তাঁর উত্তম ব্যবহার, ভালোবাসা ও সরলতার কারণে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

দুই বছরের কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি পিটাস্‌বার্গের আহমদীদের মাঝে নতুন উদ্দীপনা ও প্রাণের সঞ্চার করেন। এভাবে এ হালকাটি আমেরিকার উত্তম (হালকায়) উন্নীত হয়। এই দেখে শিকাগো জামাত তাকে (শিকাগো জামাতে) খেদমত করার আহ্‌বান জানান যেন তাদের মাঝে পিটাস্‌বার্গ জামাতের মত উদ্দীপনা ও প্রাণের সঞ্চার ঘটে। মির্যা মুনাওওয়ার আহমদ শহীদ সুদর্শন, দীর্ঘকায় ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি টিউমারে আক্রান্ত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সনে স্থানীয় হাসপাতালে তাঁর অপারেশন হয়। টিউমারের বিষ তার পেটের নাড়ী-ভুঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ায় অপারেশনটি করা হয়। অস্ত্রপ্রচারের পর দুর্বলতা বেড়ে যায়। দ্বিতীয় দিন দীনে মুস্তফার এই পরিশ্রমী সিপাহী ইহলোক ত্যাগ করে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) তাঁকে শৈশব হতেই জানতেন। তিনি তার সম্বন্ধে লিখেন, "মির্যা মুনাওওয়ার আহমদ মরহুমকে আমি তার শৈশব হতেই চিনি। এজন্যে যে, সে আমাদের নিকটাত্মীয় ছিল। অর্থাৎ আমাদের মামীর ভাই। আর আমাদের এক ভাবীর মামু ছিলেন। মরহুম মের শৈশব হতে আমার সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুতরাং আমি নির্দ্বিধায় মরহুম সম্বন্ধে একথা বলতে পারি যে, সে অত্যন্ত নেক, নিষ্ঠাবান, চৌকস, মানব প্রেমিক, সেবা ও তাগের উদ্দীপনায় ভরপুর যুবক ছিলেন। দিন হোক বা রাত, রোদ হোক বা বৃষ্টি যখনই তাকে দায়িত্ব দেয়া হতো, তিনি উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে উহা সম্পাদনার লক্ষ্যে লাব্বায়েক বলে হাযির হয়ে যেতেন। তিনি তার উপর অর্পিত দায়িত্বকে এমন মনোযোগ ও নিষ্ঠার সাথে আদায় করতেন যে মন আনন্দে ভরে উঠতো এবং অবলীলায় তার জন্য দোয়া বের হতো। আমি মনে করি যে, তাঁর সেই নেকীর কারণে তিনি জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ পান এবং দেশ হতে বারো হাজার মাইল দূরে অবস্থিত আমেরিকায় গিয়ে তবলীগ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু সৌভাগ্যবান ঐ যুবক, যে এই কল্যাণ পায়। এবং সৌভাগ্যবান ঐ মাতা-পিতা যাদের আল্লাহ্‌তাআলা এমন নেক ও ধর্মের সেবক সন্তান দান করেছেন।"

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "মির্যা মুনাওওয়ার আহমদ যিনি আমেরিকাতে মুবাল্লেগ ছিলেন তিনি আমার এক স্ত্রী উম্মে

মতীনের মামু ও মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের শ্যালক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান যুবক ছিলেন। পাকস্থলীতে টিউমার হবার কারণে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যু সবারই আসবে। তবে এমন মৃত্যু একদিকে যেভাবে জাতির জন্য গৌরবের কারণ হয় অপর দিকে দুঃখ ও হয় যে, তাঁকে পনেরো বিশ বছরে প্রস্তুত করা হলো। আর যৌবনেই তিনি মৃত্যু বরণ করলেন। দ্বিতীয় অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জামাতের মুরব্বীগণ ও জীবন উৎসর্গকারীদের নসীহত করছি যে, সফর করার সময় অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবেন। যদিও আপনারা শাহাদতের মর্যাদা পেয়ে যান কিন্তু যারা জীবিত থাকেন তাদের মনে কষ্ট থেকে যায় যে, আপনারা যদি আরো বেঁচে থাকতেন তবে আরো বেশী খেদমত করার সুযোগ পেতেন। এখন যে শহীদের কথা উল্লেখ করছি তাঁর নাম হলো **হযরত হাফেয জামাল আহমদ** সাহেব (রাঃ)। তিনি ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সনে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ সকল সৌভাগ্যবান ও বিশেষ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা যৌবনে তাঁর (আঃ) সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯০৮ সনের মে মাসে তিনি লাহোরে হযরত আকদসের দর্শন লাভ করেন। তাঁর (রাঃ) পিতা হযরত হেকিম গোলাম মুহিউদ্দীন সাহেব ১৯০১ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর হাতে বয়াত করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি চাকওয়ালের অধিবাসী ছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে হযরত হাফেয সাহেব এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি একুশ বছর পর্যন্ত মারিশাসে দীনের খেদমত করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে কোন সাহাবী তাঁর (রাঃ) মত এত দীর্ঘকাল যাবৎ খেদমতে দীনের সুযোগ পান নি। ২৭শে জুলাই, ১৯২৮ সনে তিনি কাদিয়ান হতে মারিশাসে পৌছান ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সনে মারিশাসে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে সেন্ট পেরীতে দাফন করা হয়। তাঁর (রাঃ) মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সনে খুতবা দেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি নিদর্শন রয়েছে। তা এইভাবে যে, যখন তাঁকে মারিশাসে প্রেরণ করা হয় তখন জামাতের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। এত দুর্বল ছিল যে, আমরা কোন মুবাল্লেগের যাতায়াত খরচ বহন করতে পারতাম না। আমি তাহরিক করলাম কেউ যেন এই দেশে যায়। ইহাতে হযরত হাফেয সাহেব মরহুম নিজেকে পেশ করেন।" ইহা হতে বড় নিদর্শন যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর কোন সাহাবী এত দীর্ঘকাল জেহাদের ময়দানে তবলীগ করার সৌভাগ্য পান নি।

এখন আমি **হযরত আলহাজ্জ নযীর আহমদ আলীর** উল্লেখ করছি। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রাথমিক ও নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত বাবু ফকীর আলী সাহেব অবসরপ্রাপ্ত স্টেশন মাষ্টারের সন্তান ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে গুরুদাসপুর জেলার সংলগ্ন নানগাল কোটলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আসল আবাসস্থল হলো গুরুদাসপুর জেলার সেনা সংলগ্ন কোটা চেহলা গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষা অমৃতসরের মুসলিম হাই স্কুলে অর্জন করেন। তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল কাদিয়ান হতে মেট্রিক পাশ করেন। ইহার পর ইসলামীয়া কলেজ লাহোর হতে বি, এস, সি পাশ করেন। ১৯২৮ সনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানীর নির্দেশে কাদিয়ান আসেন এবং গোলেকী নিবাসী মৌলভী ইমাম দীন সাহেবের নিকট হতে আরবী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হুযুর (রাঃ)-এর দরসে-কুরআনে নিয়মিত যোগদান করেন।

পহেলা ফেব্রুয়ার ১৯২৯ সনে তিনি মুবাল্লেগ হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সনে গোল্ড কোষ্ট অর্থাৎ ঘানাতে তবলীগের দায়িত্ব পালনের জন্য যাত্রা করেন। সেখানে চার বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৫ই মে, ১৯৩৩ সনে কাদিয়ান ফেরৎ আসেন। তিনি প্রথম মুবাল্লেগ যিনি তবলীগের জন্য কাদিয়ান হতে ট্রেন যোগে যাত্রা করেন। ট্রেনে তো অনেকেই যাত্রা করেছেন। কাদিয়ান পর্যন্ত ট্রেন পৌছানোর পর এবং কাদিয়ানে ষ্টেশন হবার পর তিনিই প্রথম মুবাল্লেগ যিনি কাদিয়ান হতে ট্রেন যোগে যাত্রা করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬ সনে তিনি দ্বিতীয়বার ঘানাতে যান। সেখানে এক বছর পর্যন্ত কাজ করেন। ইতোমধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তাকে সিয়েরালিওনে নতুন কেন্দ্র খোলার জন্য নির্দেশ দেন। ২০শে অক্টোবর, ১৯৩৭ সনে তিনি সিয়েরালিওনে যান। তিনি আট বছর পর্যন্ত সেখানে উত্তমরূপে কাজ করেন। এ সময়ে তিনি কয়েকটি স্কুল, কয়েকটি মসজিদের ভিত্তি এবং কয়েকটি জামাত ও অঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৫ সনে তিনি কাদিয়ানে ফেরৎ আসেন। আসার পথে তিনি হজ্জ বায়তুল্লাহ্ করার তৌফীক পান।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৫ সনে তাঁকে তৃতীয়বার পশ্চিম আফ্রিকার রঙ্গসুত্ তবলীগ রূপে প্রেরণ করা হয়। এ সময় তাকে শুধু রঙ্গসুত্-তবলীগের সম্মানে ভূষিত করা হয় নি বরং হযরত আমীরুল মু'মেনীন (রাঃ) 'আলী'র উপাধিও দান করেন। সুতরাং ইহার পর হতে তাঁর নাম নযীর আহমদ আলী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যায়। ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫১ সনে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তাঁর অনন্য খেদমতের জন্য হুযুর আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা তাঁকে 'কামিয়াব জেনারেল' (সফল সেনাপতি) উপাধিতে ভূষিত করেন। ৯ই মে, ১৯৫৪ সনে তাঁকে চতুর্থবার বিদেশে প্রেরণ করা হয়। এক বছরের মাথায় ১৯শে মে, ১৯৫৫ সনে তিনি সিয়েরালিওনে ইন্তেকাল করেন(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তিনি পঞ্চম মুবাল্লেগ যিনি তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তবলীগের ময়দানে শহীদ হন।

১৯৪৫ সনে যখন তাঁকে বিদেশে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো তখন এক অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর প্রত্যয়ের কথা এভাবে বলেন, যে, "আজ আমি খোদাতাআলার রাস্তায় জেহাদের জন্য যাচ্ছি" ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও চিন্তার খোরাক। কত উত্তম কথা না তার মনে পড়ল এবং কতই না উত্তম নসীহত করলেন। "আজ আমি খোদাতাআলার রাস্তায় জেহাদের জন্য এবং ইসলাম প্রচারের জন্য পশ্চিম আফ্রিকায় যাচ্ছি"। মৃত্যু মানুষের সাথে লেগে আছে।" ইহাতে তিনি তাঁর মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করছেন। "আমাদের মধ্য হতে কেউ মারা গেলে আপনারা এ মনে করবেন যে, পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকায় অল্প কিছু মাটি আহমদীয়তের দখলে আছে," অল্প মাটি আহমদীয়তের দখলে অর্থাৎ নিজ কবরকে বুঝিয়েছেন। যে অল্প স্থানে আমাকে দাফন করা হবে তা আহমদীয়তের সম্পত্তি হবে। যা পরবর্তিতে আহমদী যুবকদের পুণ্যের দিকে আহ্বান করতে থাকবে। "আহমদী যুবকদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় আমরা যে উদ্দেশ্যে (কবররূপে) ওখানকার মাটির

উত্তরাধিকারী হয়েছি তারা যেন ঐ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ওখানে পৌছায়।" আল্লাহ্ তাঁর উপর অশেষ রহমত নাযেল করুন। কতই না সুন্দর কবররূপে তিনি ওখানকার মাটি দখল করেছেন। ক্রমাগতভাবে জামাতের মুবাল্লেগীন ওখানে পৌছেছেন এবং ব্যাপকভাবে তবলীগের সুযোগ পাচ্ছেন। "অতএব আমাদের কবরের পক্ষ হতে এ দাবী থাকবে যে নিজ সন্তানদের এভাবে পরিচর্চা করেন যাতে তারা ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে থাকে যার জন্য আমরা প্রাণ উৎসর্গ করেছি।"

তিনি এক স্ত্রী ও ছয় পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। রশীদ আখতার সাহেব, মুবারক আহমদ নযীর সাহেব, মুরব্বী সিলসিলা কেনেডা, বাশারাত আহমদ বর্তমানে লন্ডনে আছেন, ডাঃ মুনির আহমদ সাহেব, আমেরিকা, লতীফ আহমদ নযীর সাহেব, করীম আহমদ নযীর সাহেব, এরা সবাই নিষ্ঠাবান আহমদী এবং নিজ পিতার নেকীকে জীবিত রেখেছেন। আল্লাহ্তাআলা এদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। এই পরিবার বর্তমানে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। উহার উল্লেখের এখানে সময় নেই।

মুকাররম গোলাম হোসেন আইয়ায। ১৯৫৯ সনের ১৭ ও ১৮ই অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তিনি ১৯০৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বুযর্গ পিতার ১৮৯১ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ফয়যুল্লাহ্ চক গ্রামে লাভ করেন যা তাঁর গ্রাম দৈহ গোলাম নবী হতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। প্রাইমারী শিক্ষা অর্জনের পর তিনি ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য 'মাদরাসায়ে আহমদীয়া' কাদিয়ানে ভর্তি হন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৌলভী ফাযেলের ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন।

১৯৩৫ সনে আইয়ায সাহেবকে তবলীগী প্রতিনিধি দলের সাথে সিঙ্গাপুর প্রেরণ করা হয়। সেখানে পনেরো বছর ক্রমাগতভাবে তবলীগী কর্মকান্ড চালানোর পর ১৯৫০ সনে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এ সময়কালে তিনি (সিঙ্গাপুরে) বহু বিপদাবলীর সম্মুখীন হন। একবার তাকে গুরুতরভাবে আহত করে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। কিছু লোক বেহুশ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে পৌছে দেয়। যেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। কিছুলোক হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাঁর নিকট যায়। আল্লাহ্তাআলার নিদর্শন যে এ সকল ব্যক্তি তার কথা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে জামাতে আহমদীয়াতে প্রবেশ করে এবং সিলসিলার জন্য জীবন উৎসর্গকারী এবং খাদেম হয়ে যায়। ঐ যুগে তিনি তার পিতাকে চিঠি লিখতেন যে, "আল্লাহ্তাআলা আমাকে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মত কুরবানীর জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

১৯৫৬ সনের ৮ই অক্টোবর তাকে আবার তবলীগের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিছুদিন সিঙ্গাপুরে কাটানোর পর তাকে বরনিওতে বদলী করা হয়। তিনি ডায়াবেটিকে আক্রান্ত ছিলেন। ১৯৫৯ সনের ১৬ই অক্টোবর তিনি ভালো অবস্থাতেই শুয়ে পড়েন। রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠেন তিনি দাঁড়াতে পারেন নি। তিনি মাটিতে পড়ে যান। তার স্ত্রী পার্শ্ববতী কক্ষ হতে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখেন এবং প্রতিবেশী, যে আহমদী ছিল তাকে ডেকে আনেন। সে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। তাকে এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পৌছানো হয়। সেখানে ছত্রিশ ঘন্টা কমাতে (সম্পূর্ণ বেহুশ) থাকার পর ১৭ ও ১৮ই অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে জেহাদের ময়দানে মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

এখন **মুকাররম মুবারক আহমদ ভাট্টি সাহেবের** উল্লেখ করছি। তিনি ১৯৭১ সনের ৭ই ডিসেম্বরে শাহাদত বরণ করেন। মুকাররম মুবারক আহমদ ভাট্টি সাহেব চৌধুরী মহাম্মদ আলী সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৯৬২ সনের তিনি কুনড়ি হতে মেট্রিক পাশ করে জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন। তিনি ১৯৭১ সনে শাহেদ পাশ করেন এবং গুজরাঁওয়ালাতে মুরব্বী নিযুক্ত হন। তার মুরব্বী হিসেবে নিযুক্তির তিন মাস পর ১৯৭১ সনের যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানের জন্য ডাকা হয়। কেন্দ্রের নির্দেশে তিনি মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানের জন্য রাবওয়াতে চলে আসেন। চেনাব পুলের হিফাযতের দায়িত পালন করে ফেরার পথে ট্রেনের দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণ করেন। তার শবদেহ সামরিক মর্যাদার সাথে মসজিদে মুবারকে আনা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মুসী হবার কারণে তাকে বেহেশ্তী মকবেরাতে দাফন করা হয়। তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার একজন বলিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তিনি (জামেয়া আহমদীয়ার) যয়ীম থাকা অবস্থায় জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ার মজলিসগুলির মধ্যে প্রথম হতো। অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, নিষ্ঠাবান এবং সেবক ছিলেন।

মুহতরাম মুহাম্মদ শফীক কায়সার সাহেব। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ)-এর যুগে শাহাদত বরণ করেন। তিনি মুহতারাম মুনশী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ১২ই অক্টোবর, ১৯৩৯ সনে সিন্ধু প্রদেশের মাহমুদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে অর্জন করেন। দেশ বিভক্তির পর গুজরাঁওয়ালার আয়মানাবাদে, সারগোধা জেলার সেলাঁওয়ালী, চিনিউটে তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুলে এবং রাবওয়ার শিক্ষা গ্রহণের পর ১৯৫৫ সনে মেট্রিক পাশ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর পরই আল্লাহ্তাআলা তাঁকে আহমদীয়া সিলসিলার সেবা করার সুযোগ দেন। প্রথমে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) সাহেবের সাথে 'খেদমতে দরবেশা' বিভাগে কাজ করেন। ১৯৫৭ সনে জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন এবং ১৯৬৩ সনে শাহেদের ডিগ্রী অর্জন করেন।

তার জ্ঞান-মূলক কর্মে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) অভিভূত ছিলেন। তিনি কয়েকবার আমার সামনে বলেছেন, আল্লাহ্তাআলার ফযলে এ যুবক জ্ঞান-মূলক কর্মে বিশেষ দক্ষতা রাখে। আরবীতে ফাযেল পরীক্ষা পাশ করেন। জামাতের অন্যান্য খেদমত করার সুযোগ ছাড়াও আল্লাহ্তাআলা তাকে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার অসাধারণ খেদমত করার সুযোগ দেন। ১৯৫৯ সনে তিনি নায়েব মুহতামিম ইশাআত ও 'খালেদ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পদে কাজ করেন। ১৯৭৬ সনে তিনি নায়েব সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এ পদেই অর্থাৎ নায়েব সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া হিসেবে কাজ করে যান। কুরআন করীমের প্রকাশনার কাজে কেন্দ্রের নির্দেশে ১৩ই মার্চ, ১৯৭৯ সনে হংকং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী ১৫ই মার্চে রেঙ্গুন পৌছান। কেন্দ্র তাঁকে সেখানে অবস্থানের নির্দেশ

প্রথম থেকেই দিয়ে রেখেছিল। সেখানে তিনি চার দিন অবস্থান করে সাংগঠনিক কাজ সম্পাদন করেন। ১৯শে মার্চ তিনি জামাতের কয়েকজন কর্মকর্তা সহ মান্ডলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রেঙ্গুন হতে মান্ডলের দুরত্ব ৪৫০ মাইল। ১৯৭৯ সনের ২০শে মার্চ ভোর বেলায় মান্ডলে পৌছান। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পর তিনি তিনি সেই দিনই রাতে (রেঙ্গুন) ফেরত আসছিলেন। পথিমধ্যে মোটর কারটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। তিনি মাথায় গুরুতরভাবে আঘাত পান এবং বেহুশ হয়ে পড়েন। সব ধরনের (চিকিৎসা) সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও তিনি বাঁচতে পারেন নি। ২২শে মার্চ নিজ প্রভুর দরবারে উপস্থিত হন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তার শবদেহ ৬ই এপ্রিল, ১৯৭৯ সনে রাবওয়াতে আনা হয়। ঐ দিনই নামাযে আসরের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। এবং তাকে বেহেশ্‌তী মকবেরাতে দাফন করা হয়। মরহুম এক স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। এক পুত্র তারেক হায়দার কেনেডার টোরেন্টোতে থাকে। দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল লতীফ লাহোরে চাটার্ড একাউনটেন্সিতে লেখা পড়া করছে। তাঁর কন্যা সাদীয়া ঝং এ উর্দুর লেকচারার।

এখন আমি যে শহীদের উল্লেখ করছি তার নাম হলো **মালেক আব্দুল হাফিয সাহেব**। তিনি ফিযিতে মুবাল্লেগ ছিলেন। মোহতরম মালেক আব্দুল হাফিয সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিখ্যাত সাহাবী হযরত নোযামুদ্দিন সাহেবের ছেলের ঘরের নাতী, ভাওয়ালপুরের মুকাররম করীম বখশ সাহেবের পুত্র এবং মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল দিয়াল গড়হী সাহেবের জামাতা ছিলেন। মুহতরম মালেক আব্দুল হাফিয সাহেব কুরআনের হাফেয ছিলেন। হাফেয সাহেব জামেয়া আহমদীয়া হতে শাহেদের ডিগ্রী অর্জন করার পর ১৯৭৪ সনে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেন। সর্ব প্রথম সারগোধা জেলার তাখত হাযারাতে সিলসিলার মুরব্বী হিসেবে নিযুক্ত হন। ইহার পর রহীম ইয়ার খান ও মরদানে মুরব্বী সিলসিলারূপে কাজ করেন। শাহাদতের দেড় বছর পূর্বে ফিজি যান। সেখানেই কর্মরত ছিলেন। হাফেয সাহেব বড়ই নেক, তাহজ্জুদ আদায়কারী ও অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ১৯৭৪ সনে যখন তাঁর নিযুক্তি তাখত হাযারাতে হয় তখন সেখানকার জামাত কঠিন বিপদাবলী ও চাপের মুখে ছিল। তাঁর উদ্দীপনা, পরিশ্রম ও সফল প্রজ্ঞাময় কর্মকান্ডে আল্লাহ্‌তাআলা জামাতের উপর ফযল করেন এবং জামাত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। হাফেয সাহেব জলসা সালানার সময় মসজিদে মুবারকে তাহাজ্জুদের নামায পড়ানোর সৌভাগ্য পান। সুন্দর কণ্ঠে কিরাআত করতেন। রমযানে তারাবীহ্ পড়াতেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ হাফেয সাহেব ৫ই আগষ্ট, ১৯৮১ সনে মমবাসার দওরাতে (পরিদর্শন) যাচ্ছিলেন। প্রধান সড়কে ট্রাকের সাথে তাঁর কারের সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে পৌছানো হয়। ১৬ই আগষ্ট, ১৯৮১ সনের রবিবারে তিনি তার প্রাণ খোদার হাতে দিয়ে দেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। ২২শে আগষ্ট, ১৯৮১তে তাঁর শবদেহ রাবওয়াতে আনা হয়। জানাযার নামাযের পর তাঁকে বেহেশ্‌ত মকবেরাতে দাফন করা হয়। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ৩৪ ছিল। শহীদ মরহুম মৃত্যুর সময় এক স্ত্রী, তিনি কন্যা ও এক পুত্র রেখে যান। দুই কন্যার বিবাহ হয়েছে। কন্যা আতীয়াতুল মজীদ সাহেবা সিরিয়ার মুবাল্লেগ মুকাররম মুহাম্মদ আহমদ নঈমের সাথে বিবাহ হয়। দ্বিতীয় কন্যা কুররাতুল আয়ন সাহেবা শাহতাজ সুগার মিলের এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মুকাররম মালেক নযীব আহমদ সাহেবের স্ত্রী। ছেলে হাফেযে কুরআন ও বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়াতে লেখাপড়া করছে। তৃতীয় মেয়ে সায়েমা বি.এ পাশ করেছে। সে এখন অবিবাহিতা। আল্লাহ্ তাকে ভালো সম্বন্ধ দান করুন।

আমি এখন **মোকাররম আব্দুর রহমান বাঙালী সাহেবের** উল্লেখ করছি। অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমি বলছি যে, শুরুতে আমি তার থেকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ নিতাম। তিনি খুবই ছোট ছোট গ্লোবিউলস্-এ এবং চিকন শিশিতে ঔষধ রাখতেন। অত্যন্ত দয়ালু ও ভালোবাসা দানকারী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কখনও কখনও অল্প করে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দিতেন। ১৯৬৩ সনে আমেরিকায় যান এবং সেইন্ট পিটাসবার্গে অবস্থান করেন। তিনি নয় বছর যাবৎ সুষ্ঠুরূপে সেবা করেন। ১৯৭৬ সনে তিনি ডেটন মিশনে কর্মরত ছিলেন। ১৬ই মে, ১৯৭৬ সনে তিনি তাঁর প্রাণ খোদার নিকট সোপর্দ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) আব্দুর রহমান বাঙ্গালী সাহেবের এক মেয়ে হলেন্ডের আমীর সাহেব হেবাতুন নুর সাহেবের স্ত্রী। আরেক কন্যা নভীদ মার্টি সাহেবের স্ত্রী। আল্লাহ্‌র ফযলে ইহাও এক নিষ্ঠাবান পরিবার।

মুকাররম বাশারাতুর রহমান কমর সাহেব, তিনি ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮২ সনে শাহাদত বরণ করেন। মুকাররম বাশারাতুর রহমান কমর সাহেব ঝং জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। মেট্রিক পাশ করার পর জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন। পহেলা জুলাই, ১৯৮২ সনে গুজরাঁওয়ালা জেলার আলীপুর চাট্টাতে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। নিজের দায়িত্ব পালনে এক খাদেম তাহের আহমদ সাহেবের সাথে মোটর সাইকেল যোগে নিজ এলাকার জামাত পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮২ সনে আলীপুর চাট্টা যাবার সময় আলীপুর শহরের নিকটে পিছন হতে একটি ট্রাক মোটর সাইকেলে আঘাত হানে। এতে দু'জনেই মাটিতে পড়ে যান এবং দু'জনের ঘাড় ভেঙ্গে যায়। তিনি ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

মুকাররম বাশারাতুর রহমান সাহেব জামেয়া আহমদীয়াতে ছাত্রাবস্থাতেই ওসীয়্যত করেছিলেন। ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮২ সনে তাঁর শবদেহ রাবওয়াতে আনা হয়। আসরের নামাযের পর আমি তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর সৌভাগ্য পাই। তাকে বেহেশ্‌ত মাকবেরাতে দাফন করা হয়। অত্যন্ত নেক প্রকৃতির, সহজ সরল, স্বল্পভাষী এবং সময়মত পদক্ষেপ নেবার যোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পড়ার ভীষণ শখ ছিল। নিজ কেন্দ্রের আহমদীদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। মরহুম অবিবাহিত ছিলেন।

আমি এখন **মরহুম মাওলানা আব্দুল মালেক খান শহীদের** কথা উল্লেখ করবো। ৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩ সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন। যদিও বর্ণনা দীর্ঘায়িত হয়েছে। তথাপি তিনি এমন মর্যাদার অধিকারী যে এ বর্ণনা দীর্ঘায়িত হয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। আরেকটি বিষয় এই যে, আমি যখন নোট তৈরী করার সময় শহীদের তালিকা প্রস্তুত

করছিলাম তখন পর্যন্ত আমি জানতাম না যে, এখন কতজন শহীদদের উল্লেখ বাকী রয়েছে। ইতোমধ্যে সৈয়্যদ আব্দুল হাই সাহেব জানিয়েছেন যে, এ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় সফর করার সময় শহীদের সংখ্যা প্রায় একশ' জন জানা গেছে। এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। তাই মনে হলো এই বর্ণনা আরো দীর্ঘায়িত হবে। কেননা, এখন অনেক শহীদের কথা বলা অবশিষ্ট রয়েছে। এজন্যে আগামীতে এ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্‌। তাদের নাম বলবো, কোথায় কীভাবে, কোন্ তারিখে এবং তাদের পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব যাতে তাদের জন্য দোয়ার তাহরীক হয়। এভাবে ইনশাআল্লাহ্‌ আগামী দুই তিন খুতবায় এই বিবরণ পূর্ণ হয়ে যাবে।

এখন আমি মাওলানা আব্দুল মালেক খান সাহেবের কথা বলছি। তিনি ২৫শে নভেম্বর, ১৯১১ সনে রামপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২০ সনে কাদিয়ানে আসেন এবং মাদরাসায়ে আহমদীয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সনে তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি হতে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা পাশ করেন। এর পর তিনি দুই বছর মুবাল্লেগীন ক্লাসে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৫ সনে তিনি তবলীগের ময়দানে দীনের সেবা শুরু করেন। প্রথমে তাকে ইউপির মুবাল্লেগ ইনচার্জের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সে সময় লক্ষ্ণৌ ইউপির কেন্দ্র ছিল। ১৯৩৯ সনে এ কেন্দ্র আগ্রাতে স্থানান্তারিত করা হলে তিনি আগ্রা চলে যান। ১৯৪০ সনে তিনি কয়েকমাস করাচীতে কাজ করেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নির্দেশে ১৯৪২ হতে ১৯৪৩ পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্থানের চারটি প্রদেশে বিস্তারিত ভ্রমণ করেন। ১৯৪৪ সনে তিনি হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সন পর্যন্ত তিনি এখানে খেদমত করেন।

দেশ বিভক্তির পর তাকে লাহোর প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি আট মাস পর্যন্ত খেদমত করেন। ১৯৪৯ সনের ৭ই নভেম্বর তাকে করাচীতে মুবাল্লেগ ইনচার্জ নিযুক্ত করা হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ১৯৫৩ সনে করাচীতে যে বিকল্প সদর আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি (রাঃ) তাঁকে উহার জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) তাঁর ধর্মীয় সেবার জন্য তাকে রইসুত্ তবলীগের উপাধি প্রদান করেন। ১৯শে জুন, ১৯৬১ সনে তিনি পশ্চিম আফ্রিকার ঘানাতে তবলীগের জন্য যান। কুমাসীতে তার যুগে মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সনে তিনি ফেরৎ আসলে তাকে করাচীতে সিলসিলার মুরব্বী নিযুক্ত করা হয়। ২৮শে জুন, ১৯৭০ পর্যন্ত তিনি এখানে কাজ করেন। এরপর তিনি কেন্দ্রে নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ নিযুক্ত হন। পরবর্তী বছরে তাকে নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ পদে নিযুক্ত করা হয়। এই পদে তিনি বারো বছর পর্যন্ত কাজ করেন।

৫ই অক্টোবর, ১৯৮৩ সনে তবলীগী সফরে যাবার সময় শেখুপুরার নিকট কার ও ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হন। যথাসময়ে চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে নিজ প্রভুর দরবারে হাজির হয়ে যান (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তার পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। তিনি হযরত জুলফিকার আলী খান গওহার (রাঃ) -এর তৃতীয় স্ত্রীর ঘরের সবচেয়ে ছোট সন্তান ছিলেন। তার বড় ভাই মুকাররম হাবীবুল্লাহ্‌ খান সাহেব এম, এস, সি, তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজ ওয়াকফে যিন্দেগী প্রফেসর ছিলেন। তারপর তাঁর এক বোন ছিল যিনি মুহতরম খলীল আহমদ মুঙ্গেরীর স্ত্রী ছিলেন। এই বোনের পর তিনি ছিলেন। তার সন্তানের মধ্যে এক ছেলে মুকাররম আব্দুর রব আনওয়ার মাহমুদ খান সাহেব আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকেন। চারজন মেয়ের মধ্যে মুহতারেমা ফরহাত সাহেবা হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের ডঃ সালেহ আলাদীন সাহেবের স্ত্রী, মুহতারেমা শওকত গওহার সাহেবা ডাঃ লতীফ আহমদ কুরেইশী সাহেবের স্ত্রী, মুহতারেমা নুসরাত জাহান সাহেবা ফযলে ওমর হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মুহতারেমা আমাতুল হাই ফযীলত সাহেবা মুকাররম সৈয়্যদ হুসেয়ন আহমদ মুরব্বী সিলসিলার স্ত্রী।

আজকের বর্ণনাকে আমি হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেবের স্মরণের মাধ্যমে শেষ করছি। এরপর থেকে আমি যেভাবে বলেছি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো। তবে কিছু না কিছু বিস্তারিত বর্ণনাও দিতে হতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলা এঁদেরকে জান্নাতের উঁচু স্থানে সমাসীন করুন এবং এদের সন্তান-সন্ততি আজ পৃথিবীর যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আল্লাহ্‌তাআলা তাদের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণে ভূষিত করুন। তারা যেন কিয়ামত পর্যন্ত শাহাদতের এই পতাকাকে সমুন্নত রাখেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে শহীদদের পদচিহ্নে চলার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ
সদর মুরব্বী

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ
রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
সালমান
অস্থায়ী অফিস ঃ
৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর স্বপ্ন ও দিব্য-দৃষ্টি

সংকলন ঃ মির্যা খলীল আহমদ কমর

(৪র্থ কিস্তি)

আল্লাহ্তাআলার নামসমূহের ব্যাপারে অসাধারণ চিহ্ন ঃ

হুযূর (আইঃ) ৩রা মার্চ, ১৯৯৫ সনে জুমুআর খুতবায় স্বপ্ন বর্ণনা করেনঃ

দশ তারিখে আমি এ কথা বলি এবং সোমবার রাত্রে অর্থাৎ ২ দিন পরের রাত্রের শেষ অংশে তাহাজ্জুদের পূর্বে কেবল এক মিনিটের একটি ছোট স্বপ্ন দেখি। আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি ইহা অনুভব করতে থাকি যে, ইহা আমি কী করছি এবং কী হচ্ছে নিজের নিয়ন্ত্রণে কথাটি ছিলো না ..... কথাটি ছোটও ছিলো। হৃদয়গ্রাহী ছিলো; কিন্তু তখন স্বপ্নের মাঝে এমন অনুভূতি হলো যে, এ বিষয় তো প্রবহমান থাকার বিষয়, স্বপ্নের সাথে শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয় নয়। সুতরাং যখন আমি জাগ্রত হই তখন ঐ চিন্তাই অব্যাহত ছিলো। স্বপ্ন শেষ হয়েছিলো এবং কয় দিন পর্যন্ত উহা আমার মনের ওপরে ছায়া বিস্তার করেছিলো। আমি বলেছিলাম যে, ঈদের পরে কোন এক খুতবায় বর্ণনা করবো। কিন্তু কয়েক দিন পূর্বে বড় কন্যা বড়ই মিনতি করে বলে যে, আপনি অবহিত নন যে, আমাদের প্রাণে কতটা ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যে, আমরা জেনে তো নিই যে, বিষয়টা কী। যদি বলা না-ই উচিত ছিলো তাহলে একেবারেই না বলতেন। তাই শীঘ্র করে বলুন নচেৎ ইহা সর্বদা পীড়া দেয় যে, কি জানি কি কথা ছিলো এবং সে বলে যে, ইহা কেবল আমারই চিন্তা নয় বরং যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন, মহিলারা বলেন, আপনার আব্বার নিকট সুপারিশ করুন যেন শীঘ্র বলে দেন। তাই আমি এখন আপনাদের নিকট বিষয়টি সম্বন্ধে বলছি।

উহা ছিলো ঐশী নামের প্রসঙ্গে এমন একটি চিহ্ন যা কিনা খোদা আমাকে দিয়েছেন। যদ্বারা খোদাতাআলার অনুগ্রহে ঐশী নামের ওপরে সত্যিকারের চিন্তা করার এক অসীম রাস্তা উন্মোচন করে। আর এমনই আশ্চর্যভাবে যে, মানুষ ইহা চিন্তাও করতে পারবে না যে, কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিন্তাধারার সাথে একথা সর্ম্পকিত। অফিসে বসা আছি। সাক্ষাতের সময় একজন আহমদী বন্ধু একজন গয়ের আহমদী কবিকে নিজের সাথে নিয়ে আসে এবং বলে যে, তিনি একটি প্রশ্ন করতে প্রত্যাশী। তখন আমি বলি, অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। তাই তিনি এ প্রশ্ন করেন। আমি একজন রক্ষনশীল কবি এবং প্রগতীশীল কবিরা আমাকে সর্বদা বলে বেড়ায় যে, তুমিও প্রগতীশীল হয়ে যাও। আমাদের ন্যায় ধ্যান-ধারণার প্রকাশ করো এবং রক্ষণশীল হওয়া ঠিক নয়। তাই আপনি আমাকে পথ প্রদর্শন করুন যে, আমার কী করা উচিত। আমি কি রক্ষণশীল থাকবো না প্রগতিশীল হয়ে যাবো। তাই তার এ প্রশ্ন শুনবার পরে আমি তাদেরকে বল্লাম দেখুন, আমার তো আপনার প্রশ্নই সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। আমার দৃষ্টিতে তো কোন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল কবির পার্থক্য হতেই পারে না। কারণ এই যে কবিরা সৌন্দর্যের পুজারী, যে-ভাবে পতঙ্গ প্রদীপের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে। যদি সৌন্দর্যের সাথে কবিতার সম্পর্ক না থাকে তাহলে কবিতা হতে পারে না। আর সৌন্দর্য খোদাতাআলার নাম থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে এবং ঐশী নামসমূহের যে সৌন্দর্য এতে যুগের অবস্থান নেই। এজন্যে যুগের দিক থেকে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলের পার্থক্য হতে পারে না।

ইহা যখন আমি বলি তখন তার চোখে, যেভাবে ভালবাসায় বিগলিত হয়, তেমনি এক আশ্চর্য ধরনের প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই এমন মনে হয় যে, আমি জিজ্ঞেস করি তখন এক প্রকার ছোট কথা ছিলো, আপনি তো বড় কথা বলে দিয়েছেন আর সবটাই মনযোগ দিয়ে পরের অংশ শুনতে চাচ্ছেন যে, আমি আরও এ বিষয়কে বর্ণনা করি, তখন স্বপ্ন ভঙ্গ হয় এবং অধিক থেকে অধিক ১ মিনিট বা এথেকেও কম সময়ে এই কথা-বার্তা হয় আর যখন আমি উঠি তখন মনসিকভাবে ঐ স্বপ্ন অব্যাহত ছিলো। এ স্বপ্নের সীমানা তো শেষ হয়ে ছিলো কিন্তু চিন্তার যে দৌড় ছুটানো হয়েছিলো উহা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিলো এবং এর ওপরে যখন আমি চিন্তা করি তখন আমি এ কথার ওপরে বিচলিত থেকে গেলাম যে, ঐশী নামের বিতর্কে কখনও কোন তফসীরকারক এ দিক থেকে কথা সুস্পষ্ট করেন নি যে, খোদার নামসমূহের ওপরে ঐ সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয় যা কিনা ব্যাকরণের নিয়মে সাধারণভাবে পাওয়া যায় যে, নামের মধ্যে সময় বা কাল নিহিত থাকে না আর যদি নামে সময় নিহিত না থাকে তাহলে এ আদিকাল সম্বন্ধীয় বিষয়-বস্তু চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হয় আর ইহা খুবই গভীর বিষয়-বস্তু যার উপর ধারাবাহিকতার সাথে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে সারা জীবন চিন্তা করলেও শেষ হতে পারে না।

কিন্তু ইহা চিন্তা করতে করতে আমার নিকট এ কথা প্রতিভাত হয় যে, ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা তো খুবই দুর্বল আর এ সংজ্ঞা উল্লেখেরই যোগ্য নয়। কেননা, সংজ্ঞা উহাই হয়ে থাকে যার সংজ্ঞা করা হয়। যে বিষয়-বস্তুর করা হয় অর্থাৎ উহাকে সীমাবদ্ধ করা হয় উহার প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রত্যেক অংশকে পরিবেষ্টন করে আর এ সংজ্ঞা খোদা ব্যতিরেকে আর কারও নামের জন্যে আসেই না। তাই ব্যাকরণবিদরা যেসব নামের কথা বলে এর ওপরে তো এ সংজ্ঞা সত্য সাব্যস্ত হতেই পারে না এবং যার ওপরে হয় তার সম্বন্ধে কখনও কোন তফসীরকারক লেখে নি যে, সংজ্ঞা ঐ সত্তা সম্বন্ধে সত্য প্রতিপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে যখন আমি আরও চিন্তা করি তখন অনেক কথাই এমন সম্মুখে আসে যেগুলোর মধ্য থেকে আমি কতক আজ আপনাদের সম্মুখে ব্যাখ্যা করছি *(আলফযল ইন্টারন্যাশনাল-১৪, এপ্রিল ১৯৯৫ সন)।*

জামাতে আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সমর্থনের সুসংবাদ

হুযূর (আই) বলেন ঃ আল্লাহ্তাআলা রাত্রে স্বপ্নে একটি সুসংবাদ দেন, আর আমি চাই যে, ঐ সুসংবাদ জামাতের নিকট আজ বর্ণনা করি। কেননা, আসলে ইহা জামাতের জন্যেই সুসংবাদ।

আমি দেখি যে, কেবল পাকিস্তানেই নয় বরং বিশ্বের অন্যান্য স্থানেও লোকদের মধ্যে বহুল সংখ্যায় জামাতকে সাহায্য করার প্রতি দৃষ্টি সৃষ্টি হচ্ছে। আর যেভাবে ঝড়-ঝাপটার সময়ে ঝাপ্টা প্রবলবেগে সৃষ্টি হতে থাকে এভাবে লক্ষ লক্ষ লোক, যাদের সাথে জামাতের সম্পর্ক নেই, তারা জামাতের সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলে আসছে। এ দৃশ্য ধারাবাহিকতার সাথে এমনভাবে দেখান হচ্ছিল এবং কখনও কখনও বিভিন্ন দেশকেও চিহ্নিত করা হয় এবং এখন আমার আশ্চর্যও লাগে যে, বাহ্যিকভাবে তো এসবের সাথে এসব কথার কোন সম্পর্ক নেই। যেমন আমেরিকার পশ্চিমে সানফ্রানসিস্কো এবং লসএঞ্জেলস প্রভৃতি এলাকা রয়েছে পশ্চিম তীরে কালিফোর্নিয়া এস্টেট যা পশ্চিমে অবস্থিত কিন্তু বিস্তৃত হচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে– এদিক থেকেও লক্ষ লক্ষ লোক জামাতের সাহায্যের জন্য দৌড়ে আসছে এবং বাইরের বিশ্ব থেকেও, প্রাচ্যেও এই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আর পাকিস্তানেও এ ঢেউ উঠেছে, ঐ দৃশ্যের পরে যা সাধারণতঃ ঢেউএর পরে ঢেউ-এর আকারে ছিল অর্থাৎ মানুষ দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু এখন মনে হচ্ছিল যে, দলে দলে খোদার সৃষ্টি জামাতের সাহায্যের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। বরং একবার তো এমন মনে হচ্ছিল যে, যেমন আমি বলি যে, বাস যথেষ্ট হয়েছে, থামো, এত প্রয়োজন নেই। কিন্তু ঢেউ আবার ওঠে কিনারে আঘাত করে যেভাবে বাইরে ভেঙ্গে পড়ে এভাবে আমি মানুষকে দেখেছি তখন একই সময়ে অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও যে, ইহা মানবীয় সাহায্য কিন্তু দৃশ্যটা ঢেউয়ের আকারে ছিল।

স্বপ্নের পর চোখ খুল্লে তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এই ইলহাম ব্যাখ্যার আকারে আমার মুখে জারি ছিল যে...তোমার সাহায্য খোদার এমন সাহসী বান্দারা করবে যাদেরকে খোদা স্বয়ং ওহী দ্বারা এ বিষয়ে প্রস্তুত করবেন। তাই আমি আশা রাখি যে, এ নতুন শতাব্দীর প্রথম বছরে এ স্বপ্নে দেখানো কেবল কোন সাময়িক কল্যাণের সাথে সম্পর্ক রাখে না বরং উহা ভবিষ্যতে জামাতের সাহায্যের ঝোঁক জাতিসমূহের মাঝে ঢেউয়ের মত একটির পরে একটি উঠবে। আর বিভিন্ন দেশে খোদাতাআলা জামাত বহির্ভূতদের প্রাণে ও জামাতের সমর্থনে উঠে দাঁড়ানোর জন্য একটি আন্দোলন সৃষ্টি করবে। একটি দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করবে এবং অধিক সংখ্যায়---

জামাতের এমন সাহায্যকারী লাভ হবে যারা জামাতের সাথে সম্পর্ক না রাখলেও আল্লাতাহ্আলার ওহীর অনুসরণে অর্থাৎ ওহী কখনও কখনও গুপ্তভাবেও হয়, ইহা আবশ্যক নয় যে, ইলহামের আকারে ভাষায় উহা প্রকাশিত হয় কিন্তু খোদাতাআলার দিকে গমনকারী আন্দোলনের আলোকে তাদের প্রাণ জামাতের সাহায্যের জন্য আকর্ষিত হবে।

(দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩)

বিয়ের প্রসঙ্গে স্বপ্ন

হুযূর (আইঃ) বলেন, কাদিয়ানে ১৯৪৫-৪৬ সনের কথা। আমি এঁর (সৈয়দা আসফা বেগম সাহেবা) সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, ছেলেদেরও জিজ্ঞেস করতেন এবং মেয়েদেরও জিজ্ঞেস করতেন। নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতেন না। যদি কেউ ভুল সিদ্ধান্ত নিতো তাহলে তার ভুল ধরিয়ে দিতেন এই বলে যে, ইহা সঠিক নয়। এভাবে খুবই এক উচ্চ পবিত্র জ্ঞান ও মাহাত্ম্যের পরিবেশে সকলের বিয়ে-সাদীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই যখন আমি এঁর সাথে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত করতে যাচ্ছিলাম। এর আগে ইস্তেখারা করি ও স্বপ্নের অবস্থায় অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় নয় বরং ঘুমন্ত অবস্থায় ইলহাম হলো এবং উহার শব্দগুলো এ রকম ছিল ঃ

"তোমার কাজের সাথে তার নাম সর্বদা জীবিত থাকবে।"

এ সময়ে আমি খুব আশ্চার্যান্বিত হলাম যে, আমার কোন্ কাজের কথা বলা হয়েছে? আমার চিন্তায়ও আসতে ছিল না যে, ভবিষ্যতে খোদা আমার মাধ্যমে কী কাজ নিবেন। কিন্তু এর মধ্যে এই আশ্চর্য বাণী ছিল যে, কার্যকরীভাবে কাজে তাঁর অংশগ্রহণের এতটা সৌভাগ্য হবে না। কিন্তু আমার সাথে সম্পর্কের কারণে খোদা তাঁকে আমার কাজসমূহে অংশীদার করে দিবেন। আর তাঁরও এতে পুণ্য লাভ হবে। এ পুণ্যে ইঁনি সর্বদা বড়ই ধৈর্য ও সন্তুষ্টির সাথে অংশ নিতে থাকেন। আর তাঁর জন্য আমার সাথে তাঁর যতটা সহযোগিতা সম্ভব ছিল তা সর্বদা করেছেন। কিন্তু বিশেষভাবে কাদিয়ানের এ যাত্রায় আমার ওপরে গভীর রেখাপাত করেছিল।

(দৈনিক আল্ ফযল রাবওয়া, ১৫ এপ্রিল, ১৯৯২)

হযরত সৈয়দা আসফা বেগম সাহেবার রোগ-ব্যাধি

হুযূর (আইঃ) বলেন, যখন একবার দোয়া করলাম তখন একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখি। এর কারণে আমার স্বস্তি লাভ হয়। কিন্তু পরবর্তী অবস্থাদৃষ্টে জানা গেল যে, আল্লাহ্তাআলার বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল যে, একটি বিশেষ ধরনে তিনি স্বস্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও নিয়তির পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠতো না। নিয়তি নিজস্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বপ্নে আমি দেখি যে, তাঁর মা আপা আমাতুস্ সালমা একটি ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং ঘরের চিত্রটি এ রকম যেভাবে বায়তুল হামদ দৈর্ঘে এবং এখানে প্রায় ২-৩ চতুর্থাংশ স্থানের সামনে তিনি এমনভাবে এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন যেদিক থেকে আমি আসছিলাম এবং বামদিকে নালার ওপরে একটি পাকের ঘর অর্থাৎ বাবুরচিখানা করা আছে আর তিনি আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। পরে আমাকে দেখে আনন্দে বলেন যে, সে এসে গেছে এবং ঘরের অবস্থা তিনি আমাকে বলেছেন যে, সমস্ত নালা বন্ধ। এবং খাবার সঙ্গে প্রস্তুত আছে। কিন্তু এদিকে আসতে পারছে না এবং কেউ খাচ্ছে না। আর পাকের ঘরে ঠিক ঐভাবেই খাবার মজুদ আছে, সাথে সাথে ইহা বলেন যে, এর পূর্বেও এভাবে নালাগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যখন ইনি আসেন তিনি কোন জিনিষ চালান এবং আকাশের দিকে উড়ে কোন জিনিষ পড়ে এবং নালাসমূহ খুলে যায়। আবার এখন এমনই হবে যে, নালাগুলো খুলে যাবে। তাই এ অবস্থায় সকালে উঠে আমার এই ব্যাখ্যা মনে বোধগম্য হলো যে, যখন প্রথমে হার্টের রোগ। এমন হয়েছিল ঐ সময়েও পাকস্থলী কোন কিছু গ্রহণ করে নি বমি করে ফেলে দিতো। আর কারণ আমার বোধগম্য হতো না। ডাক্তারেরা প্রত্যেক প্রকার ঔষধ দিতেন কিন্তু কার্যকর হতো না।

যখন হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো তখন জানা গেল যে, হার্টের ধমনীগুলো বন্ধ এবং ধমনীগুলো বন্ধ হওয়ার কারণে এসব কষ্ট ছিল। সুতরাং, ডাক্তারেরা এখন ধমনী খুলে দেন এবং পরে এনজিও প্লাষ্টিও হয়। কিন্তু ঐ সময় সাময়িকভাবে তো শামলিয়ে নেয় এবং যখন আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন তারা বলে যে, এ ধমনী খুলতে হবে এবং এ সময় তো আমার স্মরণে ছিল না। কিন্তু যখন স্বপ্ন দেখলাম তখন আমার প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ইহাই মনে পড়ছিল *(দৈনিক আল্ ফযল, ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ২)।*

হযরত সৈয়্যদা আসফা বেগমের প্রসঙ্গে

হুযূর (আইঃ) বলেন, আসফা বেগমের মৃত্যুর প্রায় ২/৩ সপ্তাহ পূর্বে তাহাজ্জদের সময় যখন চক্ষু খুল্লো তখন মনে শব্দাবলী ব্যতিরেকেই কতক কবিতার বিষয়-বস্তু ঝংকারিত হচ্ছিল। ছন্দ নির্ধারিত ছিল। কাফিয়া ও রাদীফ থাকবে এমন যেমন "দমে ইজায" "কদমে ইজায" থাকবে।

----সকালে আমি এ বিষয়কে দু'টি কবিতার ছাঁচে ঢালি এবং হাসপাতালে গিয়ে আসমা বেগমকে এ কবিতা শুনাই। তখন তার অনেক আত্মিক স্বস্তি লাভ হয়। আর অশ্রুসিক্ত চোখে কৃতজ্ঞতার আবেগ ঝলক মারতে থাকে। আমি তাকে বলি, এ নযম যখন পূর্ণ হবে এবং আগামী জলসায় মহিলাদের অধিবেশনে মোনা মেয়েকে আমাদের উপস্থিতিতে পাঠ করে শুনাতে বলবো। এরপরে তার জীবদ্দশায় এ নযম রচনা শেষ করার সুযোগ হয় নি এমন কি মনও বসে নি। প্রত্যেক দিন রোগে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হতে লাগল। প্রত্যেক রাতের দোয়াসমূহ এ জটিলতার পায়ে শিকল পড়াতো কিন্তু এক চেষ্টায় মুক্তি লাভ করলো তো অন্য একটিতে জড়িয়ে পড়তো। আস্তে আস্তে এ নিয়তির সুযোগটা চিত্রের আকারে উদ্ভাসিত হয় যে, দৈনন্দিন দোয়ার গ্রহণীয়তা এবং আরোগ্যের এ ঝলকসমূহ কেবল মনের সান্ত্বনা ও নরম ব্যবহারের প্রকাশ হয়ে দেখা দিল নচেৎ অমোঘ নিয়তিকে কোন দোয়া টলাতে পারে নি। যখন এই যাওয়ার চিহ্ন আমার নিকটে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিল তখন এক রাতে খোদার দরবারে এ বিষয়ে খুব কান্নাকাটি করলাম। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ ইবাদত এবং আদরের সীমারেখার মধ্যে থেকে আমি নিবেদন করলাম যে, আমি সন্দেহে পড়ে আছি কিন্তু নিশ্চিতভাবে কেবল তুমিই অবগত আছ যে, তুমি কী নির্ধারিত করে রেখেছো। আমার তো এ বিষয়েও ভরসা নেই যে, যা চাইবো উহা কোথায় না আবার কল্যাণের পর্দায় অনিষ্ট সৃষ্টি হয়। অতএব হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাষায় আমার কাতর অনুনয় ইহাই যে, হে আমার প্রভু! তোমার কল্যাণ থেকে যা কিছু আমার প্রতি অবতীর্ণ করো আমি উহার ভিখারী।

পরের দিন আমি যখন সংক্ষেপে স্ত্রীকে এ বিবরণ শুনাই তখন কান্নার শব্দ তো আসে নি কিন্তু চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি ইহাই বুঝতে থাকি যে, নিজের অসহায়ত্বের অবস্থায় কাঁদতে ছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পরে আমাকে ফায়েযাহ্ ও আমাতুল কুদ্দুস বলেন যে, তিনি তাঁর জন্য কাঁদেন নি বরং এ কারণে কেঁদেছেন যে, আমি তাঁর কষ্টকে এতটা অনুভব করছি। আর কঠিন ব্যাকুলতায় ভুগছি।

নযমের যে দু'টি পংক্তি তাঁর জীবনে হয়েছিল উহা কেবল শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এভাবে পরিপূর্ণ নযমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম পংক্তিতে 'বাকা' শব্দের পরিবর্তে 'শেফা' শব্দটি ছিল। এবং 'যা' এর পরিবর্তে 'কা' যেন পংক্তিগুলো ছিল–তোমার আরোগ্যের যাত্রা হলো পদে পদে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তেরী বাকা কা সফর থা কদম কদম ই'জায
বদন সে সাঁস কা হার রিশ্তা দম বদম ই'জায
তেরা ফানা কে উফুক্ব সে পলট পলট আনা
দুয়া কে দোশ তো নবযুঁ কা যের ওবম ই'জায।

(অর্থ-তোমার স্থায়িত্বের যাত্রা ছিল প্রতি পদক্ষেপে অলৌকিক ব্যাপার। দেহের সাথে নিঃশ্বাসের প্রত্যেকটি সম্পর্ক প্রতিমুহূর্তেই অলৌকিক ব্যাপার। বিলীনতার দিগন্ত থেকে তোমার ফিরে ফিরে আসা, দোয়ার কাঁধে ভর করে জীবন শিরার উত্থান-পতন অলৌকিক ব্যাপার। (চলবে)

(দৈনিক আল্ ফযল, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯২, পৃঃ ১)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

উটেচড়া নবী চাঁদে চড়া মানুষ

মক্কায় প্রবেশঃ

বিভিন্ন পথে মুসলিম বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে। হুযূর (সঃ) মুহাজির পরিবেষ্টিত হয়ে উটে চড়ে নগরে প্রবেশ করেন। তিনি কাবা শরীফের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। উটে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন হযরত যায়েদের (রাঃ) পুত্র ওসামা। আঁ হযরত (সঃ)-এর আচরণ ও মুখমন্ডলে বিজয়ীর কোন অহংকারের প্রতিফলন ছিল না। তিনি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতেন যে, উহা তাঁর বা কারো ব্যক্তিগত বিজয় নয়। এ ছিলো পরম সত্তা আল্লাহ্‌র বিজয়, ছিলো অপ্রতিরোদ্ধ সত্যের জয়। ছিলো বিশ্বমানবের কল্যাণের জয়। তাই এ জয়ের স্বীকৃতিতে কারো কোন পরাজয় নেই।

মক্কায় প্রবেশের সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ) হুযূর (সঃ)-এর উটনীর রেকাব ধরে যাচ্ছিলেন এবং সূরা ফাতহ্, যাতে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো তা তেলাওয়াত করতে ছিলেন। যা হোক হুযূর (সঃ) উটনীর উপরে থেকেই কাবা গৃহের তাওয়াফ করেন। তিনি ঐ গৃহের ভিতর ও বাইরের সব মূর্তি অপসারণ করার দায়িত্ব দেন হযরত উমরের উপর। তিনি নিজেও কিছু মূর্তি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলতে থাকেন ঃ 'এবং তুমি বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে; নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য' (২৭ঃ৮১)। সূরা বনী ঈসরাঈলের এ আয়াত হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলা হয়েছে; (বাংলা তর্জমা) 'এবং তুমি বল,' হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে উত্তমভাবে প্রবিষ্ট কর এবং আমাকে উত্তমরূপে বহির্গত কর এবং তোমার সন্নিধান হইতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।'

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখে এবং সেই সঙ্গে আবূ বকর (রাঃ)-কে সেই সব বাণী তেলাওয়াত করতে দেখে সে সময়ে মুসলমানদের এবং কাফেরদেরও মনে যে অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ ঐ দিনেই ইব্রাহীমের মোকাম পুনরায় এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো। যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হোবল দেবতার মূর্তির উপরে তাঁর ছড়ি দিয়ে আঘাত করলেন এবং মূর্তিটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন হযরত যোবায়ের (রাঃ) আবূ সফিয়ানের দিকে মুচকি হেসে তাকালেন এবং বল্‌লেন, আবূ সুফিয়ান, মনে আছে, ওহোদের দিনে যখন মুসলমানেরা জখমে জখমে জর্জরিত হয়ে একদিকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তুমি তোমাদের অহংকারে শ্লোগান দিয়েছিলে 'উলো হোবল! উলো হোবল!' এবং তুমি সেদিন হোবলকে মুসলমানদের উপর বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছিলে। আজ দেখতে পাচ্ছ, হোবল খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে সামনে পড়ে আছে ?

আবূ সুফিয়ান বললেন, 'যোবায়ের, ছেড়ে দাও, এসব কথা! আমি ঠিকই দেখতে পাচ্ছি, যদি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খোদা ছাড়া অন্য খোদা থাকতোই, তাহলে আমি আজ যা দেখতে পাচ্ছি, তা কখনই হতো না।'

অতঃপর আঁ হযরত (সঃ) কাবাঘরের ভিতরে ইব্রাহীম (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের যে সকল ছবি ছিল, তা সবই মুছে ফেলার হুকুম দিলেন এবং কা'বা ঘরের ভিতরেই, খোদাতাআলার প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ হওয়ার জন্য, দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বাইরে এলেন এবং বাইরে এসেও দু'রাকাত নামায পড়লেন। 'ইব্রাহীম (আঃ)-কে তো আমরা নবী হিসেবে মানি'– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উমর (রাঃ) ইব্রাহীম (আঃ)-এর ছবিটি মুছলেন না; রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যখন দেখলেন যে, ছবিটি যথাস্থানেই আছে, তখন তিনি বল্‌লেন, 'উমর! তুমি এটা কি করেছ ? খোদা কি একথা বলেন নি যে, 'ইব্রাহীম তো না ইহুদী ছিল, না নাসারা। বরং সে ছিল খোদাতাআলার নিকটে একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং খোদাতাআলার সাকল্য সত্যতাকে মান্যকারী এবং খোদাতাআলার একত্ববাদী বান্দা এবং সে মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না' (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৬৮)।

অতএব তাঁর (সঃ) নির্দেশ অনুযায়ী এই ছবিটিও মুছে ফেলা হলো।

যখন তিনি (সঃ) ঐসব কাজ থেকে অবসর হলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে তাঁর সামনে হাযির করা হলো, তখন তিনি বল্‌লেন, 'হে মক্কাবাসীরা! তোমরা দেখেছ যে, খোদাতাআলার নিদর্শনসমূহ কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা বলো, তোমাদের সেই সব অত্যাচার ও দুষ্কর্মের কি প্রতিশোধ তোমাদেরকে দেওয়া দরকার, যা তোমরা করেছিল এক- আল্লাহ্‌র এবাদতকারী তাঁর গরীব বান্দাদের প্রতি ?'

মক্কাবাসীরা বল্‌লো, 'আমরা আপনার কাছে সেই ব্যবহারই আশা করি যা ইউসুফ করেছিলেন তাঁর ভাইদের প্রতি।'

এ খোদাতাআলারই এক কুদরত ছিল যে, মক্কাবাসীদের মুখ থেকে সেকথাই বেরিয়ে এলো যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আল্লাহ্‌তাআলা সূরা ইউসুফে। বহু পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে (সঃ) মক্কা বিজয়ে দশ বছর পূর্বে বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি মক্কাবাসীদের সঙ্গে ঠিক তেমন ব্যবহার করবে যেমন করেছিল ইউসুফ তাঁর ভাইদের সঙ্গে। সুতরাং যখন মক্কাবাসীদের মুখ দিয়ে তার সত্যায়ন বা তসদীক করা হলো রসূলে করীম (সঃ) ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর এক মসীল বা সদৃশ এবং যখন আল্লাহ্‌তাআলা ইউসুফের মতই তাঁকে তাঁর ভাইদের উপরে বিজয় দান করলেন, তখন তিনি (সঃ) ঘোষণা করলেন।

'আল্লাহ্‌র কসম! আজ তোমাদেরকে না কোন শাস্তি দান করা হবে, না তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে (সূরা ইউসুফ, ৯৩ বাংলা তর্জমা)।

রসূলে করীম (সঃ) যখন কাবাতে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক ইবাদতে মশগুল ছিলেন এবং যখন তিনি তাঁর স্বজাতির প্রতি ক্ষমার বাণী প্রচার করছিলেন, দয়া প্রদর্শন করছিলেন, তখন আনসারদের মন ছোট হয়ে যাচ্ছিল, তাদের মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছিল এবং তারা একে অপরকে ইশারা ইংগিতে বলছিলেন যে, হয়তো আজ আমরা আমাদের রসূলকে হারাতে যাচ্ছি। কেননা, তাঁর শহরের বিজয় খোদাতাআলা তাঁর হাতেই সম্পন্ন করেছেন এবং তাঁর স্বগোত্র তাঁর উপরে ঈমান এনেছে। ঠিক সেই সময় আল্লাহ্‌তাআলা ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌কে (সঃ) আনসারদের মনের এই সন্দেহ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি তখন মাথা তুলে আনসারদের প্রতি তাকালেন এবং বললেন,

'হে আনসারগণ! তোমার মনে করছ যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ এই শহরের ভালাবাসায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর স্বজাতির প্রেম তাঁর হৃদয়কে আপ্লুত করে ফেলেছে।'

আনসাররা বল্‌লেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের মনে এইরূপ ধারণারই সৃষ্টি হয়েছে।'

আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'তোমরা কি জান না, আমি কে ? আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল। তাহলে, এটা কি করে হতে পারে যে, তোমরা যারা ইসলামের অসহায় অবস্থার সময়ে নিজেদের জীবনের কুরবানী দিয়েছ, তাদেরকে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব ?'

তিনি আরও বল্লেন, 'হে আনসাররা! এটা কখনই হতে পারে না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ্‌র জন্যই নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছি। অতঃপর আমি কোনমতেই আমার মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারি না। আমার জীবন তোমাদের জীবনের সঙ্গে এবং আমার মৃত্যু তোমাদের মৃত্যুর সঙ্গে গাঁথা রয়েছে।

মদীনাবাসীরা আঁ হযরত (সঃ)-এর এই কথা শুনে এবং তাঁর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা দেখে তারা কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে এলো এবং বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলের উপরে কুধারণা পোষণ করে ফেলেছি। কেননা, আমাদের প্রাণ এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না যে, আল্লাহ্‌র রসূল আমাদেরকে এবং আমাদের শহরকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।'

আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তোমাদেরকে নির্দোষ মনে করছেন এবং তোমাদের আন্তরিকতার সত্যায়ন করছেন।'

যে কয়জন লোক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) রায় (যুরকানী, ২য় খন্ড ও আস্‌সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খন্ড) দিয়েছিলেন যে, তাদের অত্যাচারমূলক হত্যাকাণ্ড এবং নানাবিধ যুলুম ও নির্যাতনের অপরাধের দরুন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, তাদেরও অনেককেই তিনি কোন কোন মসলমানের সুপারিশের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিল আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা। ইকরিমার স্ত্রী মনে মনে মুসলমান হয়েছিল। সে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে আবেদন করল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! ইকরিমাকেও কি আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন ?' রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বল্লেন, হ্যাঁ, আমি ওকে মাফ করে দিয়েছি।'

ইকরিমা তখন ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তার স্ত্রী তার প্রতি ভালবাসার দরুন তার পিছনে পিছনে তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। যখন সে সমুদ্রগামী জাহাজে উঠে পড়েছে এবং আরবকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলেছে, তখন পলাতক সেই সর্দারের স্ত্রী পেরেশান হয়ে তার নিকটে পৌছল এবং বল্লো, 'হে আমার চাচার পুত্র! (আরব স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদেরকে চাচার পুত্র বলে সম্বোধন করতো)। তুমি অত ভাল এবং অত দয়ালু মানুষটিকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ।' ইকরিমা বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, বলো কি ? আমার এতসব শত্রুতার পরেও কি মুহাম্মদ (সঃ) আমাকে ক্ষমা করে দিবেন? ইকরিমার স্ত্রী বল্লো, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি এবং তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল।' সে যখন ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার স্ত্রী বলছে যে, আপনি নাকি আমার মত একটা লোককেও ক্ষমা করে দিয়েছেন ? আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, 'তোমার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।'

'ইকরিমা বলে উঠলো' যে ব্যক্তি এমন ঘোরশত্রুকে মাফ করতে পারে, সে কখনও মিথ্যা হতে পারে না।' আমি সাক্ষ্যদান করছি যে, আল্লাহ্ এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্যদান করছি, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি তাঁর বান্দা এবং তাঁর রসূল।'

অতঃপর, সে লজ্জায় এত বেশী মাথা নীচু করে ফেল্লো যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার এই লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বল্লেন, 'ইকরিমা আমি শুধু তোমাকে ক্ষমাই করছি না, তুমি আজ আমার কাছে যা চাইবে, আমি তা-ই তোমাকে দিব, যদি তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকে।

ইকরিমা বল্লেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! এর বেশী আমি কি চাইতে পারি। আপনি আল্লাহ্‌তাআলার কাছে দোয়া করুন, আমি যে শত্রুতা করেছি আপনার সাথে তা যেন আল্লাহ্ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহ্‌তাআলাকে সম্বোধন করে বল্লেন,

'হে আমার আল্লাহ্! সেই সমস্ত শত্রুতা যা ইকরিমা আমার বিরুদ্ধে করেছে, তা তুমি মাফ করে দাও এবং যে সমস্ত গালিগালাজ তার মুখ থেকে বের হয়েছিল তার জন্যেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।'

এরপর, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উঠলেন এবং তাঁর নিজের গায়ের চাদর নিয়ে তা ইকরিমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং বল্লেন,

'যখন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান এনে আমার কাছে কিছু চায় তখন আমার ঘর তার ঘর হয়ে যায় এবং আমার জায়গা তার জায়গা হয়ে যায়।'

যে কয়জন লোকের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিও ছিল, যে রসূলে করীম (সঃ)-এর মেয়ে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল, হাব্বার

সে হযরত যয়নবের (রাঃ) উটের বেল্ট কেটে দিয়েছিল ফলে তিনি (রাঃ) উটের পিঠ থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর গর্ভপাত ঘটেছিল, যার ফলে দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি মারা যান। এছাড়াও সে আরো অনেক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছিল, ঐ ব্যক্তিও রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হলো এবং বললো ঃ

'হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে ইরানের দিকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আল্লাহ্‌তালা তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের শিরকের ধারণা দূর করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি অপর দেশের লোকদের কাছে যাওয়ার বদলে তাঁর কাছেই কেন ফিরে যাই না এবং নিজের পাপের কথা স্বীকার করে কেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাই না!'

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বল্লেন ঃ

'খোদা যখন তোমার হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন তখন আমি কেন তোমার অপরাধ ক্ষমা করব না ? যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। ইসলাম তোমার পূর্বের সকল পাপ মুছে ফেলেছে।'

এমন সব ভয়ানক অপরাধীকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অতি সামান্য ওসিলাতেই ক্ষমা করে দিয়েছেন, যাদের অপরাধের ঘটনা ছিল বর্ণনাতীতভাবে হৃদয় বিদারক এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দয়াশীলতা এমনভাবে প্রকটিত হয়েছে যে, তাঁর দয়া দেখে যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষও প্রভাবিত না হয়ে পারে না।

মক্কা বিজয়ের পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেসব ত্বরিৎ নির্দেশনা দিয়েছিলেন ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন তা কালের স্রোতে ভেসে যাবার নয়। এসব বরং দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণের অফুরন্ত উৎস হয়ে আছে।

হুযূর (সাঃ) সাফা পার্বত্য এলাকার এক উচ্চস্থানে আসন গ্রহণ করেন। দলে দলে ইসলাম গ্রহণকারীগণ সেখানে এসে তাঁর নিকট বয়াত হয়।

মক্কাবাসীদেরকে ইসলামী জীবন যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে রেখে কিছু দিন পর হুযূর (সঃ) সঙ্গীগণসহ হোনায়েন অভিযানে যাত্রা করেন। (চলবে)

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

জেলা সাতক্ষীরার সাত শহীদের কথা

জীবন দিয়ে যারা সাক্ষী দিয়ে যায় তারাই শহীদ।

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনই জানি
শহিদী রক্তে হেসে উঠে যবে জিন্দেগানী।

৮ই অক্টোবর, ১৯৯৯ আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন, খোতবা শ্রবণরত কতিপয় তাজাপ্রাণ মৌলবাদীদের বোমার আঘাতে ঝরে পড়ল অকালে। আহত হ'ল আরো অনেকে।

শহীদদের নাম, ১। ডাঃ এম, এ, মাজেদ, ২। জি,এম, মহিবল্লাহ, ৩। নূরুদ্দীন, ৪। সোবহান মোড়ল, ৫। জাহাঙ্গীর হোসেন, ৬। আকবর হোসেন, ৭। মন্তাজ উদ্দিন। এই সাত জন অমর প্রাণ ব্যক্তির মধ্যে পাঁচ জনের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। খুলনায় গিয়ে ডাঃ মাজেদের বাসায় আমি দু'বার থেকেছি। তাঁর বিবি কোর্মা-পোলাও করে আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে খাইয়েছেন। জামাতের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ ছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত জীবনটাই উৎসর্গ করে গেলেন। মৃত্যুতো সবারই হবে, তবে শহীদী দর্জার চাইতে উজ্জ্বল এবং উৎকৃষ্ট মর্যাদা আর কিছু হতে পারে না। মুহিবুল্লার পিতা জি, এম, মতিউর রহমান বর্তমানে সুন্দরবন জামাতের প্রেসিডেন্ট। তার নানা সামাদ গাজী সাহেবের ওয়াকফকৃত স্থানে জামাতের দ্বিতল মসজিদ। আমরা যখন সুন্দরবন জামাতে যেতাম, তখন সামাদ গাজী সাহেব আমাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তাঁর ছেলেরা সবাই খেদমতে লেগে যেত। মুহিবুল্লাহ্ খাদেম হিসাবে জলসার কাজে এবং মেহমানদের খেদমতে ব্যস্ত থাকত। তার মা পাঠাতেন ঘরে পাতা দৈ আর তার মামার (দাউদের) বাড়ী থেকে আসত ঘরে তৈরী গুড়। নূরুদ্দীনের দাদা সুফী সকিমউদ্দীন সাহেব ঐ অঞ্চলের প্রথম আহমদী। জামাতের জন্য দেওয়ানা ছিলেন তিনি। একবার খুব সম্ভব ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে আমি সুন্দরবন (যতীন্দ্র নগর) গিয়েছিলাম। সকিমউদ্দীন সাহেব তাঁর এক শিশু পৌত্রকে আমার কোলে দিয়ে বল্‌লেন, আমি এর নাম নূরুদ্দীন রাখতে চাই খলীফা আওওয়ালের নামে। আপনি একে কোলে নিয়ে দোয়া করে দিন। আমি শিশুটিকে কোলে নিয়ে দোয়া করলাম। বৎসর তিন চার আগে আমি খুলনা জামাতে গিয়েছিলাম। নূরুদ্দীন এসে বল্‌ল, 'আমি বি,এ, পাশ করেছি।' শুনে খুশী হয়েছিলাম। সেই শিশুটি আজ বি,এ, পাশ টগবগে তরুন। সোবহান মোড়ল ছিলেন জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মরহুম শামসুর রহমান সাহেবের ভাগ্নী জামাই। একবার সহায়-সম্পত্তি নিয়ে মান-অভিমান করে সোবহান মোড়ল জামাত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। আমি যখন সুন্দরবন জামাতে গেলাম তখন তাকে আমি ডেকে আনালাম এবং বল্‌লাম, মামা শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে আপনি খোদার জামাত থেকে দূরে সরে গেলেন? তিনি বল্‌লেন, 'এর সাজা আমি পেয়েছি। জঙ্গলে গিয়েছিলাম তখন ভয়নক ঝড় আসল। আমাকে উড়িয়ে আধ মাইল দূরে নিয়ে ফেলল। কোন মতে প্রাণে বেঁচে গেলাম।' আমি বল্‌লাম, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রথম হুশিয়ারী। তিনি বল্‌লেন,'আপনি আমার বয়াত নিন।' ফরম এনে বয়াত নিলাম। এর পর তার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক হয়ে গেল। আমার সামনে সব সময় তিনি হাসি মুখে থাকতেন। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় শাহাদতের কিছু দিন আগে ঢাকায় দায়ী ইলাল্লাহ্ ক্লাসে, সেই হাসি, সেই সরল, সহজ মুখ।

মন্তাজ উদ্দিন ছিলেন খুলনা জামাতের মোয়াজ্জিন, হোমিও চিকিৎসক। ইনি খতনা করাতেও পারতেন। নানা গুণে গুণী। তিনি আহত হয়ে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। খুশীতে উঠে বসলেন। বল্‌লেন, 'আগামীকাল পা'টা কেটে ফেলবে। আফসোস নেই একটা পা না থাকলেও চলে।' একজনের কাছে শুনলাম, তিনি নাকি শুয়ে বলতেন, 'ভাল লাগে না আযান দিতে মনে চায়।' বৎসরের পর বৎসর যে উচ্চ স্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলেছে সেকি চুপ করে থাকতে পারে ? অপারেশনের পর হঠাৎ করে তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেলেন।

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

'জিন্দা শহীদ' আহতদের আরোগ্য কামনা করছি। আল্লাহ্ তাদেরকে কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করুন, আমীন। শেষ করার আগে প্রসঙ্গতঃ বলছি যে খতমে নবুওয়তওলারা শুধু নবুওয়তকে খতম বা শেষ করেই ক্ষান্ত থাকে না। বরং তারা খাতামান্ নবীঈনের (সঃ) শিক্ষাকেও পদদলিত করে শেষ করে দিতে চায়। খাতামান নবীঈন (সঃ) বলেছেন, "এবাদত গৃহে অবস্থিত ধর্মীয় লোকদের উপর কোন আক্রমণ করবে না (মুসলিম, আবু দাউদ)। অথচ এরা এবাদত গৃহ বা মসজিদে বোমা নিক্ষেপ করে এবাদতরত পবিত্রচেতা মানুষকে হত্যা করে। মসজিদে নামাযরত মুসুল্লীদেরকে আক্রমণ করে আহত করে। তাই বিবেকবান মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন, এরা কার উম্মত ? এরা কি খাতামান্ নবীঈনের (সঃ) আদর্শ এবং শিক্ষাকে শেষ (খতম) করে দিতে চাচ্ছে না? এদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা কি শান্তি প্রিয়, মানবাবাদী মানুষের কর্তব্য নয় ?

যুগে যুগে যারা দিয়ে গেল প্রাণ,
গেয়ে পেল যারা ঈমানের গান,
অমর সব সেই শহীদান, লও সালাম।
সত্যের লাগি প্রাণ দেয় যারা,
মরেণাত কেউ বেঁচে থাকে তারা,
অমর সব সেই শহীদান, লও সালাম।

- আল্‌হাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন

মূল ঃ মোহাম্মদ ইসমাঈল মুনীর

একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী

১৯০৫ সালের ১৫ই এপ্রিল আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) তাঁর গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ডে রাশিয়ার জার সম্পর্কে একটি কবিতায় এই আযীমুশ্বান ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সে এক ভয়াবহ নিদর্শনের আওতায় এসে শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হবে। এই দৈব-বিপদের নিদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আকদস তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

"আজ থেকে কিছু দিন পর একটি নিদর্শনের আগমন হবে।
এতে গ্রাম ও শহর এবং চারণভূমি চক্কর খাবে।
অকস্মাৎ একটি ভূমিকম্পে মানুষ, বৃক্ষ, পাথর, সমুদ্র সব কিছু প্রকম্পিত হবে।
এক পলকে এই পৃথিবী উলট পালট হয়ে যাবে।
রক্তের স্রোত প্রবাহিত হবে যেমন প্রবাহিত হয় নদ-নদীর পানি।
রাত্রে যারা চামেলী রং এর পোষাকে থাকত
প্রাতঃকাল তাদেরকে করে দেবে চনার বৃক্ষের দৃষ্টান্ত।
মানুষ ও পাখীর হুশ হারিয়ে যাবে।
কবুতর ও বুলবুল তাদের নিজ নিজ গান ভুলে যাবে।
পুরুষদের রক্তে পার্বত্য অঞ্চলের প্রবহমান পানি
আঞ্জাবার যদের ন্যায় লাল হয়ে যাবে।
এই ভয়ে সকল জীন্ন ও মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে যাবে।
ঐ মুহূর্তে জার-এর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে যাবে।
ঐ ঐশী নিদর্শন দৈব-বিপদের একটি নমুনা হবে।
নিজের খঞ্জর বের করে আসমান আক্রমণ করবে।"

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত অসাধারণ নিদর্শনটি ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের আকারে প্রকাশিত হয়। এর ফলে রাশিয়ার জার (আওমানুফ নিকোলাস দ্বিতীয়) আল্লাহ্‌তাআলার দৈব-বিপদের নিদর্শনের শিকার হন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগতকে কাঁপিয়ে দেয়া এই দৈব-বিপদের নিদর্শনটির পূর্বে জার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবেন ও জারের ক্ষমতা অটুট থাকবে। যখন খোদার এই দৈব-বিপদের নিদর্শনটির প্রকাশের মুহূর্ত আসবে তখন জার-এর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে যাবে এবং তার প্রতাপ ও একচ্ছত্র ক্ষমতা অটুট থাকবে না। সে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়ে যাবে।

বস্তুতঃ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেল। যুদ্ধের পূর্বে জারকে পদচ্যুত করার জন্য কয়েকবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এগুলোকে বাস্তবায়িত করা যায় নি। জারের প্রতাপ-প্রতিপত্তি এতখানি ছিল যে, তার বিরুদ্ধে কোন প্রকারের কোন কথাও কারও মুখে আসে নি।

শেষ জার

আওমানুফ নিকোলাস দ্বিতীয় ১৮৬৭ সালের ৬ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল আলেকজাণ্ডার তৃতীয় ও মাতার নাম ছিল মেরী ফিওডরোনা। জার নিকোলাস দ্বিতীয় যে সময় চোখ খোলেন ঐ সময় জার বংশ প্রায় তিন শত বৎসর ধরে একচ্ছত্র শাসন চালাচ্ছিল। তার পিতা আলেকজাণ্ডার তৃতীয় এর প্রতাপ এতখানি ছিল যে, গোটা ইউরোপ তার নামে কাঁপতো।

জার নিকোলাস দ্বিতীয়কে রাজকীয় আচার-আচরণ ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষাও যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। এ দিক থেকেও শুরু থেকেই তার খ্যাতি ছিল। বস্তুতঃ রাশিয়ার কৃষকরা তাকে "আমাদের শিশু আধ্যাত্মিক পিতা" বলতো।

জারের বিয়ে হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার (যুক্তরাজ্যের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার) নাতনী আলেকজান্দ্রার সাথে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কন্যা শাহজাদী এলিসের বিয়ে হয়েছিল এক জার্মান রাজপুত্রের সাথে। এরই কন্যার সাথে রাশিয়ার জার নিকোলাস দ্বিতীয় এর বিয়ে হয়। এভাবে নিকোলাস দ্বিতীয় ইংল্যাণ্ডের বাদশা পঞ্চম জর্জের ফুফাতো বোনের স্বামী ছিলেন।

জারীনা (সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা) আন্তরিকভাবে নিজ স্বামীর ও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত জেদী ও কঠোর মেজাযের মহিলা। তিনি নিজের কথা সর্বাবস্থায় মানানোতে বিরুদ্ধাচরণ সহ্য না করাতে অভ্যস্ত ছিলেন। জারিনার মধ্যেও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল। এই কারণে তিনি এক ধর্ম যাজক রাজপুতীন (রাসপুটিন)-এর খুব প্রশংসাকারিণী ছিলেন।

জার এর অভিষেক

১৮৯০ সালে আলেকজাণ্ডার তৃতীয় এর মৃত্যুর পর যখন নিকোলাস দ্বিতীয় এর অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। ঐ সময় জার বংশ রাশিয়ার বিশাল ও দুর্জয় সুবিস্তৃত এবং সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল। এ সময় জার রাজবংশ ক্রুশীয় শক্তিরও এক বড় উৎস ছিল। ১৮৭৪ সালে উসমানী সাম্রাজ্যের সাথে গেজুকা নামক স্থানে রাশিয়ার একটি সন্ধি হয়। তদনুযায়ী রাশিয়ার জারকে বিশাল ও সুবিস্তৃত উসমানীয়া সাম্রাজ্যে বসবাসকারী খৃস্টানদেরও "ধর্মীয় নেতা" বলে স্বীকৃতি দেয়া হতে থাকলো। রাশিয়ার জার কনস্টানটেনিয়ায় একটি গির্জা বানানোর অনুমতিও আদায় করে নিলেন এবং তুর্কীদের নিকট থেকে সকল খৃস্টীয় গীর্জ্জার হেফাযতের অঙ্গীকারও নিয়ে নিয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পর তার (নিকোলাস দ্বিতীয়-এর) অহঙ্কার ও মত্ততা এতখানি বেড়ে গিয়েছিল যে, তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"তার জার রাজত্ব চিরস্থায়ী। পৃথিবীর কোন শক্তি এর পরিবর্তন করতে পারবে না।"

জার নিকোলাস দ্বিতীয় তার সময়ের সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর শাসক ছিলেন। তার শান-শওকত-এর দৃষ্টান্ত ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যেও কমই দেখতে পাওয়া যাবে। এই সময় তার এতখানি প্রভাব ও প্রতাপ ছিল যে, বড় বড় বাদশাহগণও তার কৃপা দৃষ্টির মুখাপেক্ষী বলে দৃষ্টিগোচর হতো। ফেরাউনের ন্যায় জার তার রাজত্বকে চিরস্থায়ী মনে করতেন। এই যুগে পৃথিবীতে তার রাজত্বেই প্রজাদের উপরও সবচেয়ে বেশী যুলুম হতো।

জারীনা

জারের গৃহে একের পর এক চার কন্যা সন্তানের জন্ম হলো। উত্তরাধিকারী না হওয়ার দরুন জারীনার মনে দারুণ ব্যথা ছিল। তিনি যেহেতু খুবই ধর্মপ্রবণ ও অন্ধ বিশ্বাসী মহিলা ছিলেন,তাই তিনি পুত্র সন্তানের জন্য যাদু- টোনা ও বিভিন্ন প্রকার টোটকা ঔষধ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ধর্ম যাজক দিয়ে দোয়া করাতেন ও তাদের দ্বারা টোটকা ফোটকা ও তুক্‌তাক্ করাতেন। ঘটনাক্রমে কিছুকাল পরে তার গৃহে পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। কিন্তু সে সুস্থ ছিল না। বস্তুতঃ তিনি ধর্ম যাজক রাজপুতীনের (রাসপুটিনের) সাথে সংযোগ আরও বাড়িয়ে দিলেন। সে ছিল এক জার্মান গুপ্তচর এবং হিপনোটিজমে (সম্মোহনীতে) পারদর্শী। রাজপুতীন জারীনাকে একথা বিশ্বাস করাতে সফল হয়ে গেল যে, তার পুত্র কেবলমাত্র তার মনোনিবেশ ও দোয়ার দ্বারাই সুস্থ হতে পারে। কেবল তা-ই নয়। এই ধর্মযাজক জারীনাকে বিশ্বাস করালো যে, রাশিয়ার মুক্তি তার দোয়ার সাথে সম্পৃক্ত। রাজপুতীন এই নৈকট্যের দরুন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকলো। সে আরও সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে চাইলো। কিন্তু জার এর উপর তার কোন প্রভাবই ছিল না। রাজপুতীন ভাল করেই

জানতো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জারকেও তার আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বিশ্বাসী না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার রাজপ্রাসাদে টিকে থাকা মুস্কিল হবে। বস্তুতঃ সে জারের আধ্যাত্মিক গুরু হওয়া সম্পর্কে প্রচার শুরু করে দিল যে, এই যুগে কেবল নিকোলাসকেই খোদা তাঁর হাত দ্বারা স্পর্শ করেছেন। জার প্রকৃতিগতভাবে প্রথম থেকেই আরো খ্যাতির প্রত্যাশী ছিলেন। এখন তিনি নিজেকে খোদার আতরে অভিসিক্ত বা মসীহ বলতে শুরু করলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লব

"ঐ মুহূর্তে জারের অবস্থাও শোচনীয় হবে"

জার তার ক্ষমতার নেশায় গোটা ইউরোপ দখল করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। তিনি ইসলামেরও কঠোর দুশমন ছিলেন। এক সময় তিনি রাজপুতীনের পরামর্শে তুরস্ক আক্রমণ করে সেন্ট সুকিয়ার মসজিদ থেকে অর্ধচন্দ্র নামিয়ে তার জায়গায় ক্রুশ স্থাপনের পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার এ আকাঙ্ক্ষায় সফল হতে পারেন নি।

জার এর শোচনীয় অবস্থা

অবশেষে ঐ প্রতিশ্রুত মুহূর্তের সূচনা হলে গেল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শুরু হলে সারা ইউরোপ আগুনে লাফিয়ে পড়লো। রাশিয়াকেও তার জোটের সঙ্গী হতে হলো এবং রাশিয়া যুদ্ধে শরীক হয়ে গেল। জার দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তিনি তার শক্তি ও একচ্ছত্র ক্ষমতার নেশায় বিভোর ছিলেন। কিছুদিন পর রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং রসদপত্র, খাদ্য ও গোলা-বারুদেরও অভাব দেখা দিল। যখন এ অবস্থা সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল তদবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ভয়ানক যুলুম ছিল। কিন্তু জার এ ব্যাপারে পরোয়াই করলেন না। বস্তুতঃ রুশ সেনাবাহিনী পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করতে থাকলো। জার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আগত রিপোর্টসমূহের প্রথমে তো কোন পাত্তাই দিলেন না। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তিনি নিজেই রণাঙ্গণে গিয়ে সেনাবাহিনীর সাহস বৃদ্ধি করবেন। ঐ সময় রুশ সেনাবাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধরত ছিল। জারীনা ও রাজপুতীন এই পরামর্শ দিল যে, যুদ্ধে রুশ সেনাবাহিনীর পরাজয় প্রকৃতপক্ষে প্রধান সেনাপতি গ্র্যান্ড ডিউক (যিনি জার নিকোলাস দ্বিতীয় এর চাচা ছিলেন)-এর অযোগ্যতার ফলশ্রুতি। অতএব প্রধান সেনাপতিকে পদচ্যুত করে তোপ নিজের হাতে নেয়াই সমীচীন হবে। বস্তুতঃ জার এরূপই করলেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে তোপ নিজের হাতে নিয়ে নিলেন।

জারকে শোচনীয় অবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়ার খোদায়ী সিদ্ধান্তের মুহূর্ত এখন নিকটে আসা শুরু হয়ে গেল। নিজেকে যিনি সকল ভুলের উর্ধ্বে মনে করতেন এবং নিজেকে খোদায়ী বাদশাহীর প্রতিনিধি মনে করতেন তার তোপ সেই স্বাভাবিক পরিণতির জন্ম দিতে পারতো ঘটনাবলী শীঘ্রই ইহা মঞ্চায়ন করে দিল। পরাজয় সত্ত্বেও জার যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকে ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিতে থাকলেন। রুশ সৈন্যরা অভিজ্ঞ জার্মান সৈন্যদের হাতে গাজর ও মূলার ন্যায় কাটা পড়লো। এদিকে জারীনা ও রাজপুতীন কার্যতঃ রাশিয়ার শাসক ছিলেন। তারা ঐ সকল সেনা কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদেরকে জেলে পুরলো বা হত্যা করলো যারা জারীনা ও তার আধ্যাত্মিক গুরু রাজপুতীনের বিরুদ্ধাচরণকারী ছিল। সৈন্যরা পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করার পর নিজেদের সাহস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেললো। সেনা কর্মকর্তাদের হৃদয় থেকে জার এর প্রভাব-প্রতিপত্তির ভীতি তিরোহিত হয়ে গেল। তারা খোলাখুলি বিদ্রোহ করে বসলো এবং যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলো। মানুষ জারীনা ও রাজপুতীনকে ভয়ঙ্কর ঘৃণা করতে শুরু করলো। ধর্মযাজক রাজপুতীনকে শাহযাদা ইউসুপাফ হত্যা করলো।

জার যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকা অবস্থাতেই রাজধানীতে গভর্নরের কোন কোন ভুলের দরুন মানুষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো এবং দাঙ্গা-ফ্যাসাদ শুরু হয়ে গেল। জারকে এ সংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু নিজের শক্তির মদমত্ততায় তিনি যথারীতি লোকদের উপর বল প্রয়োগ ও বিদ্রোহ দমন করার নির্দেশ প্রেরণ করলেন। এ সময় খোদার তকদীর কার্যকর ছিল। তাই শক্তি প্রয়োগ কাজে আসলো না এবং লোকদের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। জার গভর্নরের পরিবর্তন করলেন। কিন্তু তদ্সত্ত্বেও হাঙ্গামা শেষ হলো না। এ কথা শুনে জার নিজেই রাজধানীর দিকে রওনা হলেন। পথে তার কোন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি এই পরামর্শ দিল যে, মানুষ খুব উত্তেজিত, তাই এ সময় রাজধানীর দিকে যাওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু জার তার অহঙ্কার ও ক্ষমতার নেশায় ছিলেন বলে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতেই থাকলেন। অকস্মাৎ তিনি সংবাদ পেলেন যে, রাজধানী বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে। এসব কিছু ১৯১৭ সালের ১২ই মার্চেই ঘটে গেল।

জার এর পদত্যাগ

জার পথেই বিদ্রোহীদের হাতে গ্রেফতার হলেন। ১৫ই মার্চে বিদ্রোহীদের সামনে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বাদশা এবং রাশিয়ার বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি রাশিয়ার জারকে তার সিংহাসন থেকে পদত্যাগের ঘোষণা নিম্নবর্ণিত ভাষায় করতে হলো ঃ

"আমাকে যেখানে চাও পাঠিয়ে দাও। সেখানেই যাওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি এবং তোমাদের সকল সিদ্ধান্ত আমি অবনত মস্তকে স্বীকার করি।"

এ কথাগুলো ঐ শাহেনশাহের যিনি ঘোষণার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে নিজেকে অপরাজেয় শক্তির মালিক ও পৃথিবীর মহা একচ্ছত্র বাদশাহ্ মনে করতেন।

এভাবে ক্রুশীয় শক্তির রক্ষক জার রাজবংশ চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেল এবং জার নিকোলাস দ্বিতীয় এর প্রতিশ্রুত শোচনীয় অবস্থার মুহূর্ত আরও নিকটে আসতে শুরু কলো। কয়েকদিনের মধ্যেই জার এর মিত্র পক্ষ আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালী তার আশার পরিপন্থী নূতন জাতীয় সরকারকে স্বীকার করে নিল এবং জারের সকল আশা-ভরসার কবর দিয়ে দিল। জার তার নিজের চোখে এই চরম লাঞ্ছনা ও পরিতাপের দৃশ্য দেখলেন যে, তার বন্ধু রাষ্ট্রসমূহ, যাদের সাহায্যের উপর তিনি ভরসা করতেন এবং যাদের জন্য তিনি যুদ্ধ করছিলেন, তারা কয়েক দিনের মধ্যেই তার বিদ্রোহী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল এবং তার সমর্থনে ক্ষীণ আওয়াজও উঠালো না। দেশের ডাক বিভাগের অবস্থা এরূপ ছিল যে, জার এর নামে একটি চিঠি ফিরে আসলো যার ওপর লেখা ছিল "প্রাপকের ঠিকানা নেই।"

কিন্তু তার অদৃষ্টে কেবল এতটুকু লাঞ্ছনাই ছিল না। এর চেয়েও অধিক লাঞ্ছনা ও বেদনাদায়ক কষ্ট তখনো তার জন্য অপেক্ষারত ছিল, যাতে তিনি তার শোচনীয় অবস্থার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে খোদার কথা পূর্ণ করেন এবং ক্রুশ ধ্বংসকারী হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্সালামের সত্যতার এক জীবন্ত প্রমাণে পরিণত হন।

জার জেলখানায়

জার রাজ বংশের পতনের পর রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা রাজ বংশেরই এক শাহযাদা দেলভাও-এর হাতে আসলো। এ কারণে জার ও তার স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে কিছুদিন সম্মানজনক আচরণ কায়েম ছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে এই শাহযাদাকেও শাসন ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো এবং শাসন ক্ষমতা কেরনস্কী এর হাতে চলে গেল। তার শাসনকালে জার পরিবারের উপর কঠোরতা বেড়ে গেল। এতদ্সত্ত্বেও এ কঠোরতা মানবতার সীমা লঙ্ঘন করে নি। এ সময়ে জার নিজ স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে মেকোশিলো-এর রাজপ্রাসাদে বন্দী ছিলেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে বলশেভিক বিদ্রোহ কেরনস্কী সরকারের পতন ঘটালো।

নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই জার এর এরূপ বিপজ্জনক ও লাঞ্ছনাজনক অবস্থার শুরু হলো যা শুনলে কঠোরতম প্রাণের মানুষও কেঁপে উঠে।

বলশেভিকেরা জারকে টোবোলস্ক জেলে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এই জেল মস্কো থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। জার তার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বন্দী অবস্থায় বিদ্রোহীদের তত্ত্বাবধানে আট দিন ট্রেন ও সামুদ্রিক জাহাজে সফর শেষ করে টোবোলস্ক জেলে পৌছলেন। এখানে তাদেরকে একটি সাধারণ ও সঙ্কীর্ণ ঘরে রাখা হলো। এতে না ছিল কোন আসবাবপত্র এবং না ছিল অন্য কোন দ্রব্যসামগ্রী। ঘরটি ছিল আর্দ্র এবং ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্যও কোন ব্যবস্থা ছিল না। জারকে আরো অপমানিত ও হয়রান করার জন্য ১৯১৮ সালের এপ্রিলে ইউরাল জেলের পূর্বে একাটেরিন বার্গ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এই গ্রাম মস্কো থেকে এক হাজার চার শত চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ঐ সকল যন্ত্রপাতি তৈরি হতো, যা সাইবেরিয়ার খনিসমূহে যেখানে রুশ বন্দীরা কাজ করতো, সেখানে ব্যবহার করা হতো। এভাবে তাকে এরূপ জায়গায় রাখা হলো যেখান থেকে তাকে অনবরত ঐ সকল যুলুমের কথা স্মরণ করতে হচ্ছিল যা তিনি সাইবেরিয়ার জেলে নিজের অসহায় প্রজাদের উপর করে থাকতেন। এতে তার কৃতকর্মের ছবি সর্বদা তার সম্মুখে থাকতো।

এখানে তাকে দুই কামরা বিশিষ্ট একটি পুরাতন ভাঙ্গাচোরা ঘরে রাখা হলো। এই ঘরে ছিল আর্দ্রতা, ইঁদুরের উৎপাত, চড়ুই পাখীর বাসা ও মাকড়সার জাল। ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও কোন ব্যবস্থা ছিল না। সোভিয়েত সরকার এখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও কৃপণতা শুরু করে দিল। তারা এখানে দিনে মাত্র দু'বার কালো আটার রুটি ও সব্জির গাঢ় বিস্বাদ ঝোল পেতে থাকলেন। জারকে এখানে রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ, ঝাড় দেয়া ও করাত দ্বারা কাঠ চিরানোর কায়িক শ্রমের কাজ করানো হচ্ছিল। সিপাহীরা এই রাজ পরিবারের সাথে খুবই নির্যাতনমূলক আচরণ করে যাচ্ছিল। তাদের অসুস্থ সন্তানকে অমানুষিকভাবে মারধোর করছিল এবং রাজ কন্যাদের সাথে অত্যন্ত নিরর্থক হাসি-ঠাট্টা ও খোশালাপ করছিল। একদিন এক সিপাহী জারীনার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে এর ভিতর থেকে টাকা কড়ি বের করে নিল এবং বললো, এখন তোমার এর প্রয়োজন নেই। কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে সিপাহীরা প্রত্যহ নতুন উপায় উদ্ভাবন করতো। কিন্তু এতসব যুলুম সত্ত্বেও তাদের হৃদয় ঠাণ্ডা হয় নি। অবশেষে একদিন জারীনাকে সামনে দাঁড় করিয়ে যুবতী রাজকন্যার সাথে ব্যভিচার করা হলো। এই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখে যখন জারীনা কাঁদতে কাঁদতে নিজের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেন তখন যালেম সিপাহী বেয়োনেট মারতে মারতে তার মুখ ঐদিকে করে দিতো, যেদিকে যালেম ও পশুতুল্য সিপাহীদের একটি দল মানবেতর কার্য্যে নিয়োজিত ছিল।

জার এর পরিসমাপ্তি

এ সময়ে এক রাতে একাটেনি বার্গ এর কমিউনিস্টরা একটি গোপন সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, জার ও তার পরিবারকে হত্যা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত জেল দারোগা ইউরেস্কিকে জানিয়ে দেয়া হলো। ইউরেস্কি ছিল ইহুদী। সে জারের সাথে জেলখানায় কঠোর লাঞ্ছনাদায়ক আচরণ করছিল। জেল দারোগার ইহুদী হওয়াও ইহার একটি কারণ। কমিউনিস্টরা রাত্রিতে রাজ পরিবারকে হত্যা করার আদেশ দিল। দারোগা লিখিত আদেশের জন্য আবেদন জানালো। বস্তুতঃ ১৬ জন শীর্ষ স্থানীয় কমিউনিস্ট এই সিদ্ধান্তে দস্তখত করলো এবং জার পরিবারকে হত্যা করার আদেশনামা দারোগাকে হস্তান্তর করে দেয়া হলো।

অবশেষে ১৯১৮ সালের ১৬ই জুলাই-এর মধ্যরাতের অন্ধকারে এই রাজ পরিবারকে হঠাৎ জাগানো হলো এবং বলা হলো শহরে হাঙ্গামা হয়ে গেছে। এই ঘরে আপনাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। ভাল হবে যদি আপনারা তাহখানায় (গোপন প্রকোষ্ঠ) চলে যান। কেননা, সেখানে আপনারা গোলাগুলি থেকে রক্ষা পাবেন। জারীনা ভয়ের চোটে ভয়ঙ্কর অস্থির হচ্ছিলেন। তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। তাদের সকলকে জাগিয়ে পূর্তিগন্ধময় অন্ধকার তাহখানায় (গোপন প্রকোষ্ঠে) বন্ধ করে দেয়া হলো।

অল্প কিছুক্ষণ পর জেল দারোগা ইউরেস্কি তাহখানার গোপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলো এবং বন্দীদেরকে তাহখানার গোপন প্রকোষ্ঠের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিল ও টর্চ লাইটের আলোতে তাড়াতাড়ি হত্যার আদেশ শুনিয়ে দিল। জার সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বোধগম্যহীন ভাষায় কিছু বল্লেন। তার কিছুই বুঝা গেল না। তার কথার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে বা কথার জবাব না দিয়ে ইউরেস্কি তৎক্ষণাৎ নিজ রিভলবার বের করে জারের মাথায় গুলি মেরে দিল। দারোগা দ্বিতীয় ফায়ার করলেন উত্তরাধিকারীকে ও তৃতীয় ফায়ার করলেন জারীনাকে। অতঃপর চার কন্যা সন্তানকেও এমনিভাবে গুলি করে মারা হলো। এরপর সিপাহীরা একযোগে আক্রমণ করলো এবং নিজেদের বন্দুকের বেয়নেট দিয়ে লাশগুলোকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগলো। কথিত আছে যে, প্রথম গুলি লাগার পর রাজকন্যার কিছুটা জ্ঞান ফিরে এসেছিল এবং সে উঠে বসে গিয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সিপাহীরা তাদের বেয়নেট দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে দিল। বলা হয়ে থাকে যে, এই পরিবারের সাথে এক ডাক্তার ও কয়েকজন সেবকও ছিল। তাদেরকেও একই সাথে মারা হয়।

কয়েকদিন পর লাশগুলোকে এই তাহখানা থেকে বের করা হয় এবং এ অবস্থায় বের করা হয় যে, ঐগুলো খুব দুর্গন্ধময় হয়ে পড়েছিল। লাশগুলোকে একটি গরুর গাড়িতে বোঝাই করে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি জনহীন জায়গায় স্তূপাকারে রেখে পেট্রোল ঢেলে লাশগুলোকে পুড়ে ফেলা হয়। এভাবে যুগ প্রেরিত পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী চৌদ্দ বৎসরে মহাপ্রতাপের সাথে পূর্ণ হয়ে গেল যে,

"এই ভয়ে সকল জীন্ন ও মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে যাবে।

ঐ মহূর্তে জার এর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে যাবে।"

এভাবে এক একচ্ছত্র, অপরাজেয় এক বিশাল ও প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের অধিপতি, যিনি নিজেকে ক্রুশের রক্ষাকর্তা এবং খোদার আতরে সুরক্ষিত মনে করতেন, সেই স্বঘোষিত মসীহ নিজের পরিণতিতে পৌছে গেলেন এবং খোদার ক্রুশ ধ্বংসকারী সত্য মসীহ মাউদের সত্যতার জন্য একটি নিদর্শন সাব্যস্ত হলেন।

জার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শোচনীয় অবস্থায় পৌছে মরে গেলেন। তার এই নজিরবিহীন অবস্থার মধ্য দিয়ে জার আজো জগদ্বাসীকে শিক্ষণীয় কাহিনী শুনাচ্ছে। যুগ প্রেরিত পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও আরো কয়েকটি দেশের বাদশাহ্ও শোচনীয় অবস্থায় ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা উলট পালট হয়ে গেল। রক্তের নদী বয়ে গেল এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত দৈব-বিপদের নিদর্শন সব দিক থেকে প্রকাশিত হয়ে গেল। (চলবে)

নোট ঃ সাধারণভাবে সকলে জানে যে, জার এর নিহত হওয়ার তারিখ ১৯১৮ সালের ১৬ই জুলাই। ইহা ঐ সময়ের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শাহ্যাদী কেথারিনের পুস্তকে ইহাই লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু একজন রুশ স্কলার এডওয়ার্ড রাডজস্কী ২২ বৎসর গবেষণার পর "শেষ জার নিকোলাস দ্বিতীয় এর জীবন ও মৃত্যু" শীর্ষক একটি পুস্তক লেখেন। এই পুস্তকটি আমেরিকান টাইমস্ও পর্যালোচনা করেছে। এতে হত্যার তারিখ লেখা হয়েছে ১৭ই জুলাই। এতদ্ব্যতীত লণ্ডন থেকে একটি সচিত্র পুস্তক Nicholas II the last Tsar by Marvin Lyons মুদ্রিত হয়। এতে লিপিবদ্ধ আছে ১৮ই জুলাই তারিখ।

1. Nicholas II The Last Tsar by Marvin Lyons (London)

2. Nicholas II The Last Tsar by Princess Catherin

(অনেক ঘটনা ঐ যুগের ইউরেশিয়ান পত্র-পত্রিকা থেকেও গৃহীত হয়েছে)।

অনুবাদ–নাজির আহমদ ভূঁইয়া

মেরে বাচপান কে দিন

(আমার বাল্যকাল)

হযরত মাওলানা শের আলী (রাঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলী

সফীয়া বেগম

স্বামী-মরহুম চৌধুরী সালেহ মুহাম্মদ সাইয়াল

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

(তৃতীয় কিস্তি)

আমার জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার পর থেকেই 'আব্বা জ্বী'-কে নামাযের পাবন্দ (রীতিমত আদায়কারী) দেখেছি। তিনি পারতপক্ষে প্রত্যেক নামায মসজিদে মুবারক বা মসজিদে আকসাতে আদায় করতেন। আমি রাত্রে যখনই তাঁকে নফল পড়তে দেখেছি তখনই তাঁর ওপরে একটি আত্মবিগলিত সত্তার অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখেছি। যখন তিনি একবার নামায চার রাকাআত বা দু' রাকাআত আরম্ভ করে দিতেন তখন শেষ হওয়ারই বালাই যেন থাকতো না। যদি সূরা ফাতিহা পড়তেন তো প্রত্যেকটি শব্দ এত মনযোগ দিয়ে পড়তেন এবং এতবার পুনরাবৃত্তি করতেন যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেক সময় কেটে যেতো। সিজদায় যেতেন তো খোদার দরবার থেকে মাথা উঠাতেই মন চাইতো না। কখনও অসুস্থ অবস্থায় দিনের বেলায় মসজিদে যেতে না পারলে ঘরেই নামায পড়তেন। এর মধ্যে যদি কেউ কোন কাজে এসে যেতেন তখন অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে অপেক্ষা করতেন কখন তিনি নামায শেষ করবেন আর কথা হবে। যেন খোদা-প্রেমে এত নিমগ্ন ছিলেন যে, যখন তাঁর সকাশে দাঁড়িয়ে যেতেন তখন পার্থিব জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যেতেন।

আমি দশম শ্রেণীর ছাত্রী। মার্চ মাসে পরীক্ষা হতো। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে পরীক্ষা যখন দোর গোড়ায় এসে যেতো তখন শেষ রাতের দিকে উঠিয়ে দিতেন যেন আমরা পড়া প্রস্তুত করতে পারি। আমাকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে নফল পড়া শুরু করতেন। আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেতাম সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত বেশ কতকটা সময় ঘুমিয়ে নেয়া যাবে এই মনে করে। এক দু' বার আমি এমন করেছি তাই 'আব্বা জ্বী' আমার ঘরে এসে নামায আরম্ভ করে দিতেন আর একদিন আমি বই পড়া বাদ দিয়ে তাঁর নামাযের প্রতি দৃষ্টি দিলাম এবং গুণতে আরম্ভ করলাম যে, এক একটি শব্দ কত বার করে আবৃত্তি করতে থাকেন। আমি গণনা করেছি যে, এক রাকাআত নামাযে তিনি কেবল ইহদিনাস্ সিরাত্বল মুস্তাক্বীম ৭০ বারেরও অধিক পাঠ করেছেন।

ইশার নামাযের পরে অর্ধেক রাত হলে ঘরে আসতেন। ঘরে এসেও নামাযের কতক অংশ আদায় করতেন। পরে ঘুমিয়ে যেতেন। ফজরের নামাযের পূর্বেই উঠে যেতেন। ফজরের নামায মসজিদে মুবারকে গিয়ে আদায় করতেন। নামায পড়া শেষ হলে (যখন আমাদের ছুটি হতো) ছেলে-পেলেদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন। রাস্তায় খেত-খামার পড়তো। যে খেতের পাশ দিয়ে যেতেন সে সম্বন্ধে আলাপ করতেন। যদি মেঠো পথের মাঝ দিয়ে যেতেন আর সেখানে মাকড়শা জাল বুনতো এবং তারা লাইন ধরে চলতে চলতে দেখতেন তখন ছেলে-পেলেদের উদ্দেশ্য করে বলতেন, দেখে দেখে পা ফেলো তোমাদের পায়ের নীচে মাকড়শা পিষ্ট হয়ে না যায়! এদেরও প্রাণ আছে। তাদেরকে মেরে ফেলা ও কষ্ট দেয়া পাপ বিশেষ। এ ভ্রমণ ছুটির দিনে অবশ্যই হোত। কেননা, অন্যান্য সময়ে সকাল-সকালেই স্কুলে যেতে হতো। স্কুলে যাবার পূর্বে অবশ্যই কিছু খেতে বলতেন। যদিও গরমের দিনে সকাল সকাল কিছু খেতে মন চাই তো না। যদি 'আব্বা জ্বী' উপস্থিত থাকতেন তখন বলতেন, "সকালে এক গ্রাস খাওয়া মোরগ ও মাছ খাওয়া থেকেও কল্যাণকর।"

তাঁর ব্যস্ততা এক অধিক ছিলো যে, ঘরে যে সময়টুকু কাটাতেন এ সময়েও তিনি আমাদের অনেক কিছু শিখাতে থাকতেন। কখনও কখনও কোন শিশুর নিকট থেকে কুরআন মাজীদ শুনে নিতেন যেন সংশোধন হয়ে যায়। কোন দিন নামাযের পড়া নিতেন। আমরা সারাটা পরিবার যেহেতু একত্রে বসবাস করতাম তাই কখনও বড়রা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিতেন কখনও ছোটরা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য নিতেন। তিনি খুবই ধৈর্যের সাথে সবাকে বুঝাতেন। বাড়ীর উঠোন বিস্তৃত ছিলো। ঐ যুগে পায়খানা বাড়ীর শেষ কোণে হয়ে থাকতো। পায়খানার রাস্তা অতিক্রম করতে করতে আমাদের কেউ না কেউ তাঁকে আমরা প্রশ্ন করতে থাকতাম। মোটকথা বাড়ীর সদর দরজা পাড় হতে হতেও তিনি আমাদের শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা দেয়ার সময়ে বালক ও বালিকার মধ্যে সামান্য পরিমাণও ইতর বিশেষ করতেন না। তাঁর একটাই শখ ছিলো যেনো সবাই উত্তম থেকে অধিকতর উত্তম জ্ঞান লাভ করে। ছেলেদের ব্যাপারে বিশেষভাবে স্কুলের শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। সবার পড়াশুনার ব্যাপারেই চিন্তা করতেন। সুতরাং লেখা-পড়ায় যে ভাল নম্বর পেতো তার মনোরঞ্জন করার জন্যে তার মাথায় হাত রেখে দোয়া দিতেন। অথচ কম নম্বর যারা পেতো তাদেরকে ধমক দিতেন না। সে নিজেই লজ্জানুভব করতো। মেয়েদের লেখা-পড়ার ব্যাপারে এত উৎসাহী ছিলেন যে, নিজের কন্যাদের (আল্লাহ্তাআলা তাঁদের প্রতি করুণা করুন) স্কুলের পড়া শেষ হলে ঘরে বসে কুরআন মাজীদের তরজমা লিখাতেন। বুখারী শরীফ পড়াতেন। ইংরেজী ও শেখ সাদী-এর ফার্সী পুস্তক 'গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ পড়াতেন। এভাবেই পরিবারের জ্ঞান সমুন্নত থাকতো।

'আব্বা জ্বী'-এর গ্রামের নাম আদর হামাঁ থেকে যেসব ছাত্র কাদিয়ান এসে পড়াশুনা করতে চাইতো তারা 'আব্বা জ্বী' এর বাড়ীতে থাকতো। পুরুষদের মধ্যে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করা হতো। সকল সময়ে এক / দুইজন ছাত্র থাকতোই। তাদেরও নামায পড়ার জন্যে নির্দেশ দিতেন। আমাদের বাড়ী কাদিয়ানের মাঝখানে ছিলো। বর্ষার দিনে দু'আড়াই মাস ধরে ঘরের কাছাকাছি রাস্তায় সাত / আট ফুট পানি জমে যেতো। কাঠের বড় বড় তক্তা জোড়া দিয়ে নৌকো তৈরী করা হতো। ইহা কেবল চেপ্টা আকৃতির হতো। এর ওপরে চেয়ার বসানো হতো। এ নৌকোয় চড়ে ফজর ও ইশার নামাযের জন্যে নেয়া হতো। বাকী তিন নামায অফিস থেকে গিয়ে মসজিদ মুবারকে আদায় করে নিতেন।

মোটা কথা বাজামাত নামায আদায় করার এতটা বাধ্য-বাধকতা। ঝড়-বৃষ্টি প্লাবন যা-ই হোকনা কেন নামায মসজিদে মুবারকেই পড়া হতো।

জুমুআর নামাযে গেলে ঘরের ছেলেদের সাথে নিয়ে যেতেন। শিশু বড়দের সব সময় পুরো নাম নিয়ে নিয়ে ডাকতেন। লতীফ বা হালীম বলতেন না। (আব্দুল লতীফ বা আব্দুল হালীম বলতেন)। যে সময় জুমুআর নামাযের জন্যে বাড়ী থেকে বের হতেন কিছু পয়সা খুচরা করাতেন অর্থাৎ সিকি আধুলী জোগাড় করে নিজের কাছে রাখতেন। আর মসজিদে যাওয়ার সময়ে রাস্তায় গরীবদের স্বয়ং দিতেন এবং তাঁর সাথে গমনকারী ছেলে-পেলেদের সদকা করার জন্যে নির্দেশ দিতেন। যেন সদকা খয়রাত করার তাৎপর্য বিশেষ করে জুমুআর দিনে সদকা খয়রাত করার তাৎপর্যের চেতনা জাগরিত হয়। সাধারণভাবে নিঃশব্দে লুকিয়ে অভাবীদের সাহায্য করতেন। রমযান মাসের খুবই সম্মান করতেন। প্রায় সারা রাত্রই জেগে কাটাতেন। ঘরে আলো জ্বলতো। ছেলে-পেলেদেরও জাগ্রত করতেন এবং নফল পড়াতেন। ছেলে-পেলেদের রমযান মাসে কুরআন শরীফ 'খতম' (একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করা) করতে বলতেন এবং যে সন্তান কুরআন মাজীদ 'খতম' করে ফেলতো তাকে অবশ্যই পুরস্কার দিতেন। ঐ সময়ের একটা বা দু'টো রুপোর মুদ্রাই হোত না কেন। রাত্রের কিন্তু অংশ মসজিদে কাটাতেন। কিন্তু অংশে ঘরে নামায আদায় করতেন। খুব দেরী করে সেহরী করতেন। অর্থাৎ যখন একটি আযান আরম্ভ হয়ে যেতো তখন তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করার চেষ্টা করতেন। আর যখন সকল পাড়ায় মসজিদ থেকে আযানের শব্দ আসতে থাকতো সেহরী খাওয়া শেষ করতেন। ঘরে যদি কোন শিশু স্বপ্ন শুনাতো এবং স্বপ্ন পূর্ণ হতো তখন খুবই খুশী হতেন। মাথায় হাত রেখে দোয়া করতেন। পুরস্কারও দিতেন। ঘরের সব লোককে ইহা বলতেন যে, সে এ স্বপ্ন দেখেছে এবং তা পূর্ণ হয়ে গেছে।

সর্বদা বলতেন, বৎসে ! চাইবে তো খোদার নিকট চাও। তিনি সকলকে দিয়ে থাকেন। দোয়া করো। দোয়া করার জন্যে খুবই তাগিদ দিতেন। যদি কোন শিশুর দোয়া কবুল হয়ে যেতো তাহলে খুবই খুশী হতেন।

আমার ভাই আব্দুল হালীম যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন একদিন মসজিদে নামায পড়ছিলো এবং সিজদায় দোয়া করতে ছিলো যে, হে আল্লাহ্ ! আমাকে পরীক্ষায় পাশ করতে দাও। অন্য নামাযী শুনছিলো। নামায পড়ার পরে ঐ ব্যক্তি 'আব্বা জ্বী'-কে বল্লেন, আপনার নাতি সিজদায় তার পরীক্ষা পাশের জন্যে দোয়া করতে ছিলো। তিনি খুবই খুশী হয়েছিলেন। তাকে ডেকে দোয়া দিলেন। ঘরে বল্লেন, যখন ফল বের হলো আর ভাই পাশ করলো তখন 'আব্বা জ্বী'-এর আনন্দের সীমা ছিলো না। প্রত্যেককে বল্লেন যে, আব্দুল হালীম দোয়া করেছে আর খোদা তার দোয়া কবুল করেছেন। ভাই-এর পা আর মাটিতে পড়ে না। কারও দোয়ার জন্যে কোন পত্র আসলে আমাদেরকেও বলতেন। এ ব্যক্তির জন্যেও দোয়া করবে। ঘরে ছোট বড় সবার স্বাস্থ্যের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। যদি রাত্রে তাঁর কানে কারও কাশি বা হাঁচির শব্দ যেতো তাহলে সকালে তাকে 'নূর' হাসপাতালে নিয়ে যেতেন। ঔষধের ব্যবস্থা করাতেন। ঘরে এসে বারে বারে ঔষধ পান করার জন্যে তাগিদ করতেন। শিশুদের দুধ খাওয়াবার জন্যে বিশেষ তাগিদ দিতেন। প্রায় রাত্রেই জিজ্ঞেস করতেন কোন শিশু দুধ পান না করে তো ঘুমায় নি। সন্ধ্যায় যখন দুধ দোহনকারী মহিষের দুধ দোহন করা আরম্ভ করতেন 'আব্বা জ্বী' আমাদেরকে এক একটি বাটি ধরিয়ে দিতেন এবং আমরা মহিষের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম এবং কাজের লোক প্রত্যেকের বাটি ভরে ভরে দিয়ে যেতো আর আমরা সেখানেই তা পান করে নিতুম। বাড়ীতে ফল-ফলাদি ও মিষ্টি আসলে আমার মা ও 'আম্মা জ্বী'কে বলতেন, ছোটদের যখনই কোন ফল-ফলাদি বা কোন নিয়ামত দাও তখন বলবে, ইহা খোদা তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন।

ছোটদের প্রত্যেকটি সিদ্ধ বাসনা পুরো করার জন্যে পুরোপুরি চেষ্টা করতেন। একবার ঈদের সময় আমার ভাই-এর নতুন টুপি আনা হয় নি। নতুন কাপড় পরে সে জিদ করলো যে, নতুন টুপিও তার চাই। ঈদের দিন ছিলো। বাজার বন্ধ ছিলো। 'আব্বা জ্বী' দোকানদারের বাড়ী / গেলেন, দোকান খোলালেন এবং টুপি এনে ভাইকে পরিধান করালেন। পরে সবাই এক সাথে ঈদের নামায পড়ার জন্যে ঈদের মাঠে গেলেন।

আমাদের মা ও 'আম্মা জ্বী' আমাদেরকে বাল্যকালে শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'আব্বা জ্বী' চৌকি থেকে নামতে গেলে চৌকির নীচ থেকে তাঁর জুতো তাঁর পায়ের নিকট এনে দিবে। যখন 'আব্বা জ্বী' চৌকি থেকে পা নীচে নামাতেন তখন আমাদের প্রত্যেকেরই চেষ্টা থাকতো যে, সবার আগে কে এ কাজটি করে দিতে পারে।

'আব্বা জ্বী' সর্বদা জুতো পরার সময় ডান পায়ে জুতো আগে পরতেন এবং সাথে আমাদের বুঝাতেন যে, সর্বদা ডান পায়ে আগে জুতো পরা উচিত। দাঁড়িয়ে আমাদের মাথায় হাত রেখে দোয়া করতেন। তিনি সর্বদা নিজের সন্তানদের মাথায় হাত রেখে অতীব স্নেহের সাথে দোয়া করতেন।

ছোটদের সাথে কঠোরতা এবং ধমক দেওয়াকে খুবই অপসন্দ করতেন। খালি পায়ে হাঁটতে সর্বদা নিষেধ করতেন। যদি কখনও ঘটনাক্রমে কোন শিশুর পায়ে জুতো না থাকতো তখন লাঠির মাথা পায়ে স্পর্শ করতেন, মারতেন না। কেবল ছুঁতেন এবং বলতেন, খালি পায়ে হাঁটবে না। সর্বদা জুতো পরে থাকবে। মেঝ মামা আব্দুর রহীম একটু কড়া মেজাযের লোক ছিলেন। কখনও কখনও ছোটদের ধমক দিতেন। যদি 'আব্বা জ্বী' জানতে পারতেন তবে অবশ্যই কড়াকড়ি করতে নিষেধ করতেন। তাঁর কঠোর কথা অর্বাচীন বলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতো। পরে ইস্তিগফার পড়া আরম্ভ করে দিতেন।

আমাদের মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি করতেন। বাড়ীর মেয়েদের অংশে মোহরাম ব্যতিরেকে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারতেন না। আমরা বাড়ী থেকে কেবল স্কুলে যেতে আসতে পারতাম আর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে যাওয়া মেয়েদের নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু উহার অনুভূতি রাখতেন এবং বাড়ীর প্রশস্ত উঠোনে খেলা-ধূলা করতে বলতেন। সতর্কতার সাথে বেড়াতে পাঠাতেন। যখন প্রথম গাড়ী আসলো তখন আমি খুবই ছোট্ট ছিলুম। সম্ভবতঃ ৪/৫ বছর বয়সের ছিলুম। সব সন্তান-সন্ততিকে নিয়ে গেলেন। গাড়ীর বগী ও ইঞ্জিন দেখালেন। সাথে সাথে বুঝাতে থাকলেন যে, গাড়ীর সাথে বগী কীভাবে সংযোজিত হয়। আমি কোথায় যেন শুনেছিলুম যে, গাড়ী যেখানে থামে সেখানে খাবার-দাবার জিনিষ পাওয়া যায়। সেখানে আমি বায়না ধরলাম যে, আমি কিছু খাবো। কাদিয়ানে সার্কাস আসলো। তাই 'আব্বা জ্বী' মামাকে বল্লেন, ছোটদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে সার্কাস দেখিয়ে নিয়ে এস। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

জাতির বিবেক ঃ সমকালীন পত্র-পত্রিকার দৃষ্টিতে

নাড়ি নক্ষত্র
বোমা হামলা

..... ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ও পাকিস্তানী বর্বর হানাদার বাহিনী মসজিদ মন্দিরকে রেহাই দেয়নি। নারী সম্ভ্রমকে যারা মূল্য দেয়নি তারা মসজিদের মূল্য বুঝবে এটা আশা করা যায় না। ধর্মের নামে, ইসলামের নামে ওরা একাত্তরে যা করেছে তার একটা অশুভ, ভয়ঙ্কর পুনরাবৃত্তি বর্তমান বাংলাদেশে চলছে।

জনকণ্ঠ ভবন উড়িয়ে দেবার একটা কারণ না হয় পাওয়া যেতে পারে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত যে গতিতে, যে হারে জামাত-আলবদর-রাজাকার তথা মৌলবাদী অশুভ শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে তা কিন্তু স্তব্ধ হয়নি। আমাদের রাজনৈতিক তৎপরতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ফ্যাসিবাদী ও মৌলবাদী রাজনীতির গোড়ায় পানি ঢেলে যাচ্ছে। এ কথা অবিসংবাদিতভাবে সত্য যে, সেক্যুলার রাজনীতির পথ নিষ্কটক হচ্ছে না, ধর্মান্ধতার ভেল্কিবাজি রাজনীতি ভেতরে ভেতরে বলবান হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভাব প্রখর করা হচ্ছে। এই বলবান পশু শক্তির প্রতিকূলে জনকণ্ঠ, আজকের কাগজসহ প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের পত্রিকা কথা বলে যাচ্ছে রোখা-চোখাভাবে। তাই এসব পত্রিকা ভবনে মাইন ঢুকিয়ে দেয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু মসজিদের মতো বিতর্ক-বিবর্জিত পবিত্র প্রার্থনালয়ে কেনো বোমা ফাটিয়ে মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ মুসল্লিদের হত্যা করা হবে ? এমন বর্বরতা যারা ঘটাতে পারে তারা দেশের শত্রু, মানবতার দুশমন। দেশের শত্রুরা বর্তমান সরকারের চিহ্নিত কিছু দুর্বলতার অজুহাত ধরে সারাদেশে নৈরাজ্য আর অস্থিরতা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মসজিদে বোমা অনুপ্রবেশের আরো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। রাজনীতির মত ইহজাগতিক ও জটিল বক্রগতি সম্পন্ন বিষয়ের সঙ্গে যারা ধর্মকে টেনে আনছেন নিজস্ব ফায়দা হাসিলের জন্য তারাই অথবা তাদের চ্যালা-চামুন্ডারাই চাচ্ছে দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ঘোলা হোক। আমরা মাছ শিকার করি। এদের কাছে কবি নজরুলের সেই অমর বাণীর তাৎপর্য মূলহীন, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'। মসজিদে মানুষ হত্যার চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কী হতে পারে ? .....

মাহমুদুল বাসার

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক আজকের কাগজ ঃ ১৩.১০.৯৯)

মসজিদে হত্যা

একটি মৌলবাদী দৈনিক ঘটনার পরের দিন পত্রিকায় একটি অভিনব আবিষ্কার করলেন। ৮ই অক্টোবর খুলনায় নিরালা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত দেয়ালঘেরা আহমদীয়া মসজিদ জুম্মার নামাযে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের শক্তি বা বোমার শক্তি এতই প্রবল ছিল যে ঘটনাস্থলেই ছয়জন মুসুল্লি মারা যান এবং ইমাম সাহেবও গুরুতরভাবে আহত হন। আহত হন বেশ কয়েজন। ঘটনাটি সম্পর্কে এ মৌলবাদি পত্রিকার পাঠকদের অবহিত করার জন্য পত্রিকাটি আবিষ্কার করল যে বোমাটি পাতা হয়েছিল নিজেদেরই খুন করার জন্য। অর্থাৎ এটি ছিল একটি আত্মঘাতী বোমা। যে উর্বর মস্তিষ্কের ঐ আবিষ্কারটি করেছিলেন তিনি এর কোন কারণ দিয়েছেন বলে পত্রিকার পাঠকরা মনে করেন না। যে যুক্তি দেয়া হয়েছে তা যুক্তিদাতাকেও সন্তুষ্ট করেছে কিনা তা নিয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে আত্ম রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে বিপক্ষকে আক্রমণ করা। সমরবাদীরা বলতে পারবেন রণক্ষেত্রে এ প্রবাদ সত্য কিনা। ব্যবসায়ী মৌলবাদী পত্রিকাটি ঐ পন্থায় বিশ্বাসী। ভিয়েতনামে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনামীদের উপর এবং ভিয়েতনামের শহরগুলোর উপর বিষাক্ত বোমা বর্ষণের সময় এর প্রতিবাদে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজেদের গায়ে আগুন লাগিয়ে দগ্ধ হয়ে মারা যেতেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এই প্রতিবাদের ভাষা এশিয়ার অন্য দু'একটি দেশেও দেখা গেছে। যদি ধরে নেয়া হয় এই আত্মঘাতী হওয়াটাই সবচেয়ে প্রতিবাদ তাহলে আহমদীয়াদের সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কোন কারণ ইদানীং ঘটেনি।

একথা অবিদিত নয় যে, ধর্ম ব্যবসায় মৌলবাদীরা পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছে। এই জেহাদের সেপাহশালার ছিল জামায়াতে ইসলামের আমীর মৌলবাদী মওদুদী। সে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করে দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত। কিন্তু দেশ বিভাগের সাথে সাথে পাকিস্তানে উপস্থিত হয়ে ধর্ম ব্যবসায় আরম্ভ করে। '৫২ সালে লাহোরে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নেতৃত্ব দেয়। যে দাঙ্গা এতই বয়াবহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে পাকিস্তান সরকার লাহোরে সীমিত সামরিক আইন জারি করে। দাঙ্গা দমনের পর পাকিস্তান সরকার দাঙ্গায় যে লাগামহীনভাবে মানুষদের খুন করা হয় তার জন্য একটি বিচার কাজ আরম্ভ হয়। সেই বিচারে প্রধান আসামী ছিল জামাত প্রধান ধর্ম ব্যবসায়ী মওদুদী। বিচারে এই ধর্ম ব্যবসায়ীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। কিন্তু বিচারের রায় কার্যকর করা হয়নি। কয়েক বছর কারা ভোগ করার পর সামরিক শাসনের দ্বারা তার মৃত্যুদন্ড রহিত হয় এবং জেল থেকে মুক্তি পায়। এই ধর্ম ব্যবসায়ী ইহুদীদের বিরুদ্ধেও প্রচন্ড রকমের প্রচারণা করত। নিয়মিত নিষ্ঠুর পরিহাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেই সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসকের দ্বারা তার হৃদয় দুয়ার খোলার জন্য ভর্তি হয়। কিন্ত বিধিবাম ঐ নামকরা চিকিৎসকও তাকে রক্ষা করতে পারেননি। বেঁচে থাকার সময় ইহুদী বিরোধিতা করা যায়। কিন্তু পরপারের ডাক আসলে ঐ ইহুদীর শরণাপন্ন হতে হয় বাঁচার জন্য। এই দ্বৈত ব্যবহার জামায়াতের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আহমদীয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে খুলনায়। ঐ সম্প্রদায়ের মীরপুরের একটি মসজিদের পাশের একটি মসজিদে তিনটি মিষ্টির বাক্স অরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনটি মিষ্টির বাক্সের মধ্যে

একটিতে একটি বোমা পাওয়া গিয়াছিল। বকশিবাজারে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রধান মসজিদটি অবস্থিত। সেখানেও দুটি বোমা আবিষ্কৃত হলো। হঠাৎ করে বাংলাদেশের আহমদীয়া মসজিদে বোমা আবিষ্কৃত হলো কেন ? এবং সব জায়গা বাদ দিয়ে কেবল মসজিদেই বা কেন ? আরও খুব শক্তিশালী একটি ট্যাংক বিধ্বংসী স্থলমাইন একটি ব্রিফকেসে পাওয়া গেল 'জনকণ্ঠ' অফিসে। হঠাৎ বোমাবাজি করার জন্য এই প্রচন্ড শক্তিশালী স্থলমাইন 'জনকণ্ঠ' অফিসে কেন ? এখানেই আছে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিকৃত রাজনীতি। বলা হয়েছিল যে স্থলমাইনটি যদি বিস্ফোরিত হতো তাহলে 'জনকণ্ঠে'র গোটা বাড়ীটাই হয়ত ধ্বংস হয়ে যেত। 'জনকণ্ঠ'কে কেন বেছে নেয়া হলো।

এর উত্তর খুব সহজ। এই পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিশালী কণ্ঠ।

একাত্তরের এই ধর্ম ব্যবসায়ীদের ভূমিকা নিয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ নাই। এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ইসলাম রক্ষার জন্য বাঙালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। তখন যারা গণহত্যায় নাম লিখিয়েছিল তারাই রাজনীতিতে '৭৫-এর পরে পুনর্বাসিত হয়ে আবার ধর্ম ব্যবসায় আরম্ভ করেছে। এদের বিকৃত রাজনীতি এখন অনেকগুলো ফ্রন্টে কাজ করছে। দেশে যাতে অস্থিতিশীলতা ব্যাপক আকার ধারণ করে জনমানুষকে নিরাপত্তাহীন করে দেয় সেই তাদের লক্ষ্য। তাই কয়েক মাস আগে মুক্তিযোদ্ধার সংগঠন কাজী আরিফকে কুষ্টিয়ায় একটি সভায় তার সহযোগী সমেত হত্যা করা হয়। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই যশোরে উদীচীর সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি প্রগতিশীল এই সংগঠনের সম্মেলনে আসা নিরীহ লোকদের হত্যা করে। দু'মাস আগে বিরোধী দলের একটি মিছিল 'জনকণ্ঠ' অফিসের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মিছিলের ভিতর থেকে গুলি করে একজন কর্মকতাকে আহত করা হয়। জনকণ্ঠের সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি করা হয়। রাজনৈতিকভাবে মাঠ গরম করতে না পেরে এই ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিকরা এখন বেছে নিয়েছে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ দীর্ঘকালের। '৯২/৯৩ সালে মানিক মিয়া এভিনিউতে একটি তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লোক খ্যাপান। ওখান থেকে দাবী ওঠে যে আহমদীয় সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের উর্দুভাষীদের মধ্য এশিয়ার ধর্মীয় নেতা বলে চালিয়ে দেয়া হয়। একটি চরের পীর এই দাবির অন্যতম উদ্যোক্তা। এই পীরের একাত্তরের ভূমিকার কথা জনমানুষের এখনও মনে আছে। এই শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীরা পাকিস্তানে আহমদীয়দের অমুসলমান ঘোষণা করিয়েছে। একই ঘোষণা বাংলাদেশ সরকারকে দিয়ে করাতে চাচ্ছে। তাহাফফুজে খতমে নবুয়াতের এক নেতা ঘোষণা দিয়াছিল যে তারা ইচ্ছা করলেই বকশিবাজারে কাদিয়ানীদের আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এই ঘোষণা বর্তমান বোমাতঙ্কের কয়েক সপ্তাহ আগে। এই উস্কানিমূলক বক্তৃতার পরও তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখে এক কট্টর মৌলবাদী ধর্ম ব্যবসায়ীর একটি পত্রিকা তাহাফফুজদের দাবী অনুযায়ী আহমদীয়দের অমুসলমান ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানায় সরকারের কাছে। হুমকি দিয়ে বলে, সরকার না করলে এ দায়িত্ব ধর্মপ্রাণ মানুষ হাতে তুলে নেবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই ধর্মপ্রাণ মানুষদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। যারা এই ধরনের দাবি তুলছে তারা সকলেই মাওলানা উপাধীধারী। এদের জ্ঞানের উৎস পাকিস্তান। এরা বাংলাদেশের সংবিধান সম্পকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এরা জানে না যে, বাংলাদেশে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে প্রত্যেক নাগরিককে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ৪১ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের নাগরিকরা যেকোন ধর্ম অবলম্বন, পালন ও প্রচার করতে পারে। এই অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায় নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার আছে। এই সাংবিধানিক অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

তারা এই সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করে জনসভা করছে ভাড়াটে ধর্ম ব্যবসায়ীদের নিয়ে। বোমা পাতছে মসজিদে মসজিদে। মানুষ খুন করছে, হুমকি দিচ্ছে। ইতোপূর্বে এরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক ধর্মগুরুর উস্কানিতে আহমদীয়দের মসজিদ আক্রমণ করে ভাঙচুর করেছে, বকশীবাজারস্থ মসজিদ আক্রমণ করেছে। মসজিদের পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ করেছে এবং মানুষজনকে মারধর করেছে। '৯২-সালে খুলনায় সন্ত্রাসীরা মসজিদের একজন ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে আহমদীয় সম্প্রদায়ের লোকদের উপর হামলা চালায়। '৯২ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আহমদীয়রা শিকার হয় ধর্ম ব্যবসায়ীর হাতে। খুলনায় হয়েছে, রাজাশাহীতে হয়েছে। '৯৯-এর ফেব্রুয়ারীতে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের কোলদিয়া গ্রামে আহমদীয়রা আক্রান্ত হয় একটি মসজিদকে কেন্দ্র করে। গত ১৫ই অক্টোবর নাটোরে আহমদীয়রা আক্রান্ত হন। এদের নারী ও শিশুও ছিল।

'৯৯ সালে এই মৌলবাদীরা ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে আহমদীয়দের বিরুদ্ধে। আবার ধুয়া তুলেছে অমুসলমান ঘোষণা দেয়ার জন্য যা অসাংবিধানিক। এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে আহমদীয়দের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।

কে এম সোবহান
(সৌজন্যে ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২১.১০.৯৯)

শান্তির শ্বেত কপোতরা আজ দুষ্ট বাজপাখির নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত

শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে দেশে আজ এসব কী হচ্ছে ? কোথায় চলছি আমরা ? এটি আজ আমার একার প্রশ্ন নয়। জাগ্রত বিবেক সাধারণ জনগণের প্রশ্ন, এর উত্তরের জন্য আজ চারিদিকে হাহাকার উঠেছে কিন্তু কে দিবে তার উত্তর ? সরকার নাকি বিরোধীদল ? কার কাছে জবাব চাইব ? কেউ কি চিন্তা করে দেখেছেন ? আমার বিবেক বলে এখন কারো কাছে জবাবের প্রত্যাশা করে একে অপরকে দোষারোপ করে শান্তির শ্বেত কপোতদেরকে দুষ্ট বাজপাখীর নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত করে হত্যা করতে হত্যাকারীকেই সাহায্য করা হবে। চারিদিকে আজ যেখানে দাবি উঠেছে শান্তিময় বিশ্ব চাই, শান্তিময় দেশ চাই, সেখানে যখন আজ বর্তমানে সারাদেশের বাস্তব আতংকিত ও দিশেহারা অবস্থা দেখি তখন স্বাভাবিকভাবে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে প্রশ্ন, নিজ মনে নিজ বিবেকের কাছে, কি জন্য ? কার

স্বার্থে ? আজ দেশে অরাজকতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি। অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত। আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে কাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে ? সাধারণ বিবেকবান জনসাধারণকে চিন্তা করে দেখার অনুরোধ করে মূল লেখায় যাচ্ছি।

বোমাতঙ্ক

খুলনা মহানগরীতে গত ৮ অক্টোবর শুক্রবার বেলা ১.৩৫ মিনিটে জুমার নামাযের খোৎবা পাঠের সময় নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকায় আহমদিয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে ৭জন নিহত, আহত প্রায় অর্ধশতাধিক, একই দিন ঢাকাস্থ মীরপুরে অপর একটি মসজিদে মিষ্টির প্যাকেটের ভিতর বোমা, দৈনিক বহুল প্রচারিত পত্রিকা জনকণ্ঠ অফিসে বোমা, পরের দিন আবারও ঢাকার বক্‌শীবাজারে অবস্থিত আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সদর দফতরে টাইম বোমা প্রভৃতি নজীর-বিহীন ঘটনা দেশের সুস্থ নাগরিকদের আতংকিত করে তুলেছে। এধরনের ঘটনা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হত পাকিস্তানের চালচিত্রে। পাকিস্তানে শিয়া কর্তৃক সুন্নীদের মসজিদে এবং সুন্নী কর্তৃক শিয়াদের মসজিদে বোমা মেরে, গুলি করে শত শত লোককে হত্যাকরা হচ্ছে এসব তাদের জন্য খুবই ডাল ভাত। এছাড়াও আইন পাশ করে আহমদীয়া মুসলমানদের অমুসলিম ঘোষণা করার মত অনৈসলামিক কার্যসমূহ ও তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে তথাকথিত মৌলবাদীদের সংগঠন তাহফুজে খতমে নবুওত পাকিস্তানে ইসলামের নামে যে তান্ডব নৃত্য চালাচ্ছে তা আমরা নিয়মিত সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারছি। এছাড়া তালেবান, ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী কর্তৃক সারা বিশ্বে তথাকথিত ইসলামী সন্ত্রাস সভ্য সমাজকে আতংকিত করে রেখেছে। উন্নত বিশ্বে তাদের এহেন কর্মকান্ডের কারণে ইসলামকে আজ সন্ত্রাসবাদের জঘন্যতম অপবাদ মাথায় নিতে হচ্ছে। এসব শুধু পত্র-পত্রিকার কল্যাণে পড়েই আসছি। কিন্তু আমাদের দেশে তা কল্পনাই করিনি, কারণ আমরা বীরের জাতি। যুদ্ধ করে অন্যায় ও মৌলবাদের ধাড়ালো নখকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে, এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এদেশকে স্বাধীন করেছে। অনেক শহীদের রক্তে পবিত্র হয়েছে আমার স্বাধের মাতৃভূমি। এদেশে তাই এহেন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আস্ফালন আমাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে। এসব ঘটনার মাঝে বিরোধীদলসমূহের আচরণও সন্দেহজনক। এমতাবস্থায় সাধারণ জনগণের নিরব প্রশ্ন, কোথায় চলেছি আমরা ? কোন সমাবেশ স্থলে বোমা পেতে রেখে অংশগ্রহণকারীদের হত্যা করার ঘটনা খুলনায় প্রথম নয়, এর আগে খুলনার পার্শ্ববর্তী যশোরে সাংস্কৃতিক সংস্থা উদীচীর সম্মেলনে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কিন্তু কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মচরণরত ধর্মপ্রাণ মানুষকে এমন কাপুরোষিত প্রক্রিয়ায় হত্যা করার ঘটনা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ইতিপূর্বে ঘটেনি। এ দুঃসাহস প্রদর্শনকারীরা শুধু যে, সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তা নয়, রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতিও চ্যালেঞ্জ জানানোর মত স্পর্ধা দেখিয়েছে। কারণ ঘটনাটি সুপরিকল্পিত এবং পাকিস্তানী ভাবাদর্শে এবং সেখানকার কায়দায় এবং আদলে করা হয়েছে। এরপরও তাহফুজে খতমে নবুওত ও অপর কয়েকটি ধর্মীয় লেবাসধারী এদেশীয় সংগঠনের উদ্যত আস্ফালন সাধারণ জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। এত সাহস তারা কোত্থেকে পায় ? কাদের মদদে তারা এত শক্তিশালী ? বাংলাদেশের সংবিধানে যেখানে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মচরণের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে এবং সকল ধর্মাবলম্বীর মান মাল ও ধর্মাচরণের নিশ্চয়তা বিধান করার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি হামলা করা, ধর্মাচরণের বাধা দেয়া, বিশেষ করে হত্যার পরিকল্পনা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন ছাড়া আর কি হতে পারে ? খুলনার আহমদিয়া মসজিদের ঘটনা ছাড়াও দেশের অপরাপর জায়গায় যে সব ঘটনা ঘটেছে তা নাশকতামূলক কাজ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যারা ঐ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা যদি ক্ষমতাসীন সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে করে থাকে তা খুবই জঘন্যতম কাজ করেছে। সাধারণ জনগণ তাদেরকে কোন দিনই এ ঘটনার জন্য ক্ষমা করবে না। খুলনার মসজিদে সংঘটিত এ ন্যাক্কারজনক ও বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো এবং তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া সকল গণতান্ত্রিক শক্তিরই কর্তব্য ও দায়িত্ব। যারা ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়ে জনমনে শান্তি আনয়ন করা উচিত বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন।

আশংকার বিষয় সংঘবদ্ধ এসব দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে না তুললে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অপরাপর ধর্মের সাধারণ নিরীহ লোকগুলির মনে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এদেশের আবহমানকালের সংস্কৃতি ও দেশের স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে। এসব অবস্থার আলোকে জনমনে প্রশ্ন ওদের ঘৃণ্য পদপাত কেন এই বাংলার বুকে ? ঘাতক কখনও মানুষ নয়, ওরা পশুরও অধম, পশুরও ধর্ম আছে, মমতা আছে ঘাতকের কোন ধর্ম নেই, নেই কোন মমতা। উপরোক্ত ঘটনাবলীর আলোকে নিম্নে ধর্মীয় জগতের কিছু পর্যবেক্ষণ পাঠকদের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ধারাবাহিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রকৃত ধার্মিক ও সাম্প্রদায়িক কোন দিন কোন সময় এক হতে পারে না। তাদের উৎপত্তি ও কর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন, প্রকৃত কোন ধার্মিক কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা যার ভিতর আছে সে কোন দিনও ধার্মিক হতে পারে না। একটি ধর্মীয় জগতের আদি কথা, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন ধার্মিকের হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। ধার্মিক ব্যক্তি হবেন পরমতসহিষ্ণু ও উদারমনা, ধার্মিক সম্পূর্ণভাবে মানবীয় গুণাবলীতে বিভূষিত ও আদর্শ দ্বারা পরিচালিত। তার দ্বারা মানবতা আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরঞ্চ তিনি ন্যায় ও সত্যের পতাকাবহনকারী হবেন। সত্য ন্যায়ের আদর্শবহনকারী সত্যের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সবসময় একাগ্রচিত্তে কাজ করে থাকেন। ধর্মীয় সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কখনো ধার্মিক বলে গণ্য হতে পারে না। এরা সব সময়ে সর্ব মহলে নিন্দিত। এদেরকে কেউ সম্মানের সাথে দেখেনা। সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। সে অবস্থাতেই পরিত্যাজ্য। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের মত-পথের ও আদর্শের লোক আল্লাহ্‌র দেয়া সকল প্রাকৃতির সুযোগ-সুবিধাদি আলো-বাতাস, পানি প্রভৃতি সমানভাবে ভোগ করছে। ঐশী গুণাবলীতে যারা বিভূষিত তাদের কাছে এসবের কোন তারতম্য বা ভেদাভেদ নেই। ইসলাম বিশ্বময় পরিব্যপ্তি একটি ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার নাম। সংকীর্ণ গন্ডীতে ইসলামকে আবদ্ধ রাখার ন্যায় হীন প্রচেষ্টা যাদের, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামেরই শত্রু। শান্তি ও ন্যায়ের মানবতার ধর্ম ইসলামের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শ সকলের জন্য অবারিত। নবী করীম (সঃ) সকল মানবমন্ডলির জন্য রহমত স্বরূপ, তিনি সকল

মানুষের শান্তির জন্য ও সকল প্রকার উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য আদর্শ স্বরূপ। কাজেই এমন মহান ধর্মে সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না। ইসলামের শিক্ষানুরাগী সমগ্র মানব এক জাতি ও ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য, মানব জাতির মুক্তির জন্য, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, শান্তিময় বিশ্ব গড়ার জন্যই মানবতার নবী, প্রেমের নবী শান্তির ধারক ও বাহক বিশ্বের সকল মহলের সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য আদর্শ মানব হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। কোন সন্ত্রাসের শিক্ষা ইসলাম বা ইসলামের নবী (সঃ) দেননি। সে কারণেই এ ধর্মের নাম রাখা হয়েছে ইসলাম অর্থাৎ শান্তি।

এ ধর্মের লোকেরা সকলে সর্ব সময়ে একে অপরকে আহবান করে "আসসালামু আলাইকুম" আমি আপনার শান্তি কামনা করি এ বলে। সুতরাং যারা ধর্মের লেবাস পড়ে এবং ধর্মের অপব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত তাদের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) পক্ষ হতে লানত ছাড়া আর কিইবা আছে। ইসলামে এক মুসলমানের রক্ত অপর মুসলমানের জন্য হারাম করা হয়েছে। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এনিয়ে রক্তপাত, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ধর্মের পবিত্র ও শান্তিময় শিক্ষাকে কলঙ্কিত করে শান্তিময় উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে যারা বেমালুম ভুলে গিয়ে মানুষের জীবন ও ইজ্জত নিয়ে ছিনি-মিনি খেলায়মত্ত তারাই সাম্প্রদায়িক। উক্ত ধর্মীয় সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িকদের দ্বারা শুধু হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাই নয়, বরঞ্চ মুসলমান-মুসলমানেও দাঙ্গা বেধে যায় যা ওহাবি সুন্নি-শিয়া-আহমদী (কাদিয়ানী) ইত্যাদি দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়। ১৯৫৪ ইংরেজীতে পাকিস্তানে ও রক্তাক্ত কাদিয়ানী দাঙ্গা যা (বিচারপতি মুনীর কমিশনের রিপোর্টেই বিস্তারিত পাওয়া যায়) সহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীগত দাঙ্গা অহরহ হচ্ছে। তখন সাম্প্রদায়িকতার অনলে প্রতিপক্ষের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হয়ে যায়। সামাজিক শান্তি হয় ভূলুণ্ঠিত ও মানবতা হয় পদদলিত। ভিন্নমত পোষণের কারণে কারো উপর চড়াও হয়ে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অধিকার ধর্ম কাউকে দেয়নি। বিনা কারণে আঘাত করার শিক্ষা ইসলামে নেই। যতটুকু অপরাধ সংগঠিত হয় সে অনুপাতে বিচার করা ইসলামের শিক্ষা। লেখনীর মাধ্যমে কেউ কোন বিষয় উপস্থাপন করলে যদি তা কারো কাছে মনঃপুত না হয় তবে লেখনীর মাধ্যমেই এর জবাব দেয়া যুক্তিসংগত। এক কথায় কলমের জবাব কলমের মাধ্যমেই দেয়া বৈধ ও স্বীকৃত উপায়। এজন্য গুপ্তঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে হত্যালীলা চালানোর অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। ধর্ম নিয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে। তবে মতভেদ ও মত পার্থক্য সত্বেও বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মাঝে সেতু-বন্ধন রচিত হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ্ উবাই বিন সলুল নবী করীম হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য করা সত্বেও তাকে জাগতিক সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্বেও কতলের ফতোয়া দেননি, বরঞ্চ আবদুল্লাহ্র পুত্র তাকে নিধন করতে তলোয়ার নিয়ে উদ্যত হলে মানবতার নবী ও শান্তির ধারক ও বাহক হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাকে থামিয়ে দেন এবং ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দেন। এমন কি মোনফেক সর্দার মারা গেলে তিনি তার জানাযা পড়ান। এই হল ইসলামের সুমহান শিক্ষা। সাম্যবাদের আদর্শ এবং মহানবীর চারিত্রিক অনুপম সৌন্দর্য। বিরুদ্ধবাদীরা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কে সত্যের বাণী প্রচারের কারণে নানাভাবে ত্যক্ত, বিরক্ত ও কষ্ট দিয়েছে। পূর্ববর্তী নবী রাসূলেরা (আঃ) সত্যের অমিয় বাণী প্রচারে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। কিন্তু তারা সত্য প্রচারে বিরত হননি, পরবর্তীতে বিজয়ের সময়ে পূর্ববর্তী ব্যবহারের জন্য তাদের প্রতিশোধ নেননি। সত্যের প্রচারক হযরত মোহম্মদ (সঃ) ধর্মের প্রচার ও বিস্তার সাধনের জন্য ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হননি। বরঞ্চ "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই" কোরানের সার্বজনীন শিক্ষাকে তিনি প্রাত্যহিক জীবনে ও কর্মকান্ডে প্রমাণ করে গেছেন। এ শিক্ষাকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকান্ডে লালন ও পালন করা উচিত। সারা বিশ্বের প্রতি পালকের অতি প্রিয় মানব সর্বজনমান্য শান্তির প্রচারক ও আদর্শ মানব হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর শিক্ষা ছিল নিম্নরূপ ঃ ১) যুদ্ধের ময়দানে কোন ফলবান বৃক্ষ কর্তন করবেন না ২) কোন মহিলাকে আঘাত করবেনা। ৩) ঈমান আনার পর কোন কাফেরকে হত্যা করবেনা ৪) কোন উপাসনালয় বিধ্বস্ত বা ধ্বংস করবেনা এবং অন্যের উপাসনালয়কে নিজেদের উপাসনালয় বানাবে না। ৫) শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ ততটুকু নেয়ার অধিকার আছে যতটুকু আঘাত সে তোমাকে করেছে ৬) আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে শত্রুর সাথে ব্যবহার করবে।

মক্কা বিজয়ের দিন রসূল করিম (সঃ) যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বের নিকট রেখে গেছেন তা বর্তমান সুসভ্য বিশ্বেও বিরল ঘটনা হিসাবে ইতিহাসে বিরাজমান। এছাড়া মক্কা বিজয়ের পর মানবতার ও শান্তির ধারক ও বাহক ক্ষমার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আবু জেহেলের পুত্র হযরত ইকরামা ও হযরতের প্রিয় পিতৃব্য হযরত হামজার (রাঃ) কলিজা ভক্ষণকারী হিন্দুকে যেভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় দ্বিতীয়টি আছে কিনা আমার জানা নেই। সুতরাং এমন আদর্শের ধারক ও বাহকের অনুসারী উম্মত হওয়ার দাবিদার আমরা মুসলমান, যাদের জীবনের প্রাত্যহিক অবস্থার একমাত্র আদর্শ হিসাবে আল্লাহ্তাআলা হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শকে আদর্শ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন অন্য কারো নয়। এমন সার্বজনীন আদর্শের নবীর উম্মত হয়ে আমাদের দ্বারা এসব মানব কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী ঘটনা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন ? সাধারণ বিবেকবান জনসাধারণের নিকট এ প্রশ্ন রইল। চিন্তা করুন নিজের মনের কাছে ও নিজের বিবেকের কাছে। আমরা কোন পথে চলছি ? তথাকথিত ইসলামের নামধারী সেসব সন্ত্রাসের জন্মদাতা মৌলবাদীদের ধর্মকে অনুসরণ করব ? নাকি মানবতার নবী, প্রেমের নবী, অসাম্প্রদায়িক নবী ও প্রকৃত ধার্মিকের আদর্শ মানবের ধর্ম প্রকৃত ইসলামের অনুসরণ করব ? আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে অন্যথা আমি, আপনি, সমাজ, দেশ বা ধর্ম কেউ নিরাপদ নয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলী ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রকৃত পক্ষে দেশের সঠিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়ে পারস্পরিক দোষারোপ করে পরিত্রাণের উপায় নেই। দেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গেলে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী সংরক্ষণ করতে হলে, মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে দেশের প্রতিটি গণতন্ত্রকামী বিবেক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবতাবাদী শক্তিগুলিকে এ মানবতা বিরোধী নারকীয় তান্ডব সৃষ্টিকারী, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিকারী অশুভ চক্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকল শ্রেণীর সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা সকল গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক দল এবং গোষ্ঠী এ ধর্মান্ধ অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তৎপর হউন।

আজ ৭১ এর পরাজিত শক্তি, ৭৫ এর ঘাতক এবং স্বৈরাচার জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানী কায়দায় মাঠে নেমেছে। তারা ধর্মীয় পবিত্র স্থান সমূহ এবং সংবাদপত্র ও বিশেষ বিশেষ স্থাপনাকে ধ্বংস করে ঘোলা পানিতে মাছ ধরার মতলবে নেমেছে। দেশে অরাজকতা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এদেশকে পিছনের দিকে ঠেলে দেবার পায়তারা করা হচ্ছে।

চারিদিকে জনগণ যখন আতংকগ্রস্থ ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তখন বিরোধী দলসমূহ জনগণকে সাহস, সংশয় ও সান্ত্বনা দেবার পরিবর্তে ঘাতকদেরকে বাঁচানোর জন্য হরতাল ডেকে দেশে অরাজকতা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। সুতরাং দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে প্রকৃত ধার্মিক হোন। তবে দেশ-জাতি ও সমাজ সকলে উপকৃত হবে। ধার্মিকতা মানুষকে মানবতাবোধ শিখায়। আর সাম্প্রদায়িকতা মানবতাকে পদদলিত ও কলংকিত করে। ইসলাম সকলকে স্বাধীনতা দিয়েছে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করার। যে গ্রহণ করবে সে আলোকিত হবে। আলো ও সত্যকে গ্রহণ করে নিজে আলোকিত হউন ও অপরকে আলোকিত করান, তাতে দেশ ও জাতি আলোকিত হবে। নতুন শতাব্দীর আগমনে এ প্রত্যাশায় ও কামনায়।

পশুত্বের বিরুদ্ধে জেগে উঠুক মনুষ্যত্ব।

এহোক নতুন শতাব্দীর শ্লোগান।

- নেছার আহমদ

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক পূর্বকোণ ঃ ২৮/১০/৯৯)

কবিতা

শহীদের স্মরণে

সবকিছু যেমন মূল্য দাবী করে
তেমনি ধর্ম জগতও এথেকে পিছিয়ে নেই
একেবারে আবেদনের সাথে
হৃদয়ের অন্তরালের গভীর অভিনিবেশ দিয়ে
সে-ও দাবী করে মূল্যের।
খোদা কিনে নিয়েছেন মু'মিনের জান-মাল
তাঁরই বেহেশ্‌তের বদলে।
তেমনি আবর্তে কতজনই না নিঃশেষে
কোন আপত্তি ছাড়াই
পান করেছেন শাহাদতের পেয়ালা।
জড়জগৎ থেকে বহু দূরে চলে যায় তারা
মানব জীবনের চাহিদার চরম উৎকর্ষ সাধিত
হয়ে যায়, ...
তাদের এই কুরবানীতে।
খোদার নামকে সমুজ্জ্বল করতে
হৃদয়কে চৌচির করে দেয় তারা।
সমস্ত অস্পৃশ্যতাকে মুছে দেয় তারা
নিজেদের রক্ত স্রোতে।
একটি বারের জন্যও ভাবে না . . . .
ভাববেই বা কেন ?
খোদার আরশ থেকে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।
ফিরিশ্‌তাদল করে পুষ্পস্তবক বর্ষণ,
পৃথিবীর জন্য তারা জানিয়ে দিয়ে যায়
আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার অমোঘ-বার্তা।
সেই পথ ধরে রক্তধারার ধারাবাহিকতায়
শুধু খোদারই জন্য . . . . .
৮ই অক্টোবর '৯৯ সনে
খুলনার আহমদী মসজিদে
নিঃশেষে ঝরে গেল সাতটি তাজা প্রাণ।
আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে রইল তাঁরা
তাঁরা মরে নি-জীবিত . . . .
আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না।
খোদার পথে জীবন দিয়ে তাঁরা
হয়েছেন ধন্য . . . .
আর আমরা ?
আমাদের ঋণ আরো বেড়ে গেছে
তাদের রক্তের ঋণ পরিশোধের দায়ভার
যে একান্তই আমাদেরই।
যে পথে জীবনকে দান করলো তাঁরা
আকাশের সাতটি তারা,
সে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে
এ রক্ত-ঋণের শোধ।
খোদার দরবারে তাঁরা গৃহিত,
যুগ-খলীফার বাণীতে তাঁরা সমুজ্জ্বল।
"ডাঃ মাজেদ, আলী আকবর, সোবহান মোড়ল, নূরুদ্দীন,
মহিবুল্লাহ্, জাহাঙ্গীর আর মুমতাজউদ্দীন।"
এই সাতজন খোদার দরবারে আজ
সমাসীন, নিজ নিজ আসনে।
সমস্ত দুঃখ-কষ্ট শেষে আজ
পৌছেছেন তাঁরা আপন প্রভুর সকাশে।
বাংলার ইতিহাসের আরেকটি প্রদীপ্ত
ভাস্কর্য নির্মিত হলো;
এই সাতজন কারুশিল্পী দ্বারা,
নতুন ইতিহাস লিখা হলো
এই সাতজনকে দিয়ে,
নব যুগের সূচনা হলো
সাতটি তারকায় উদয়ে।

মোহাম্মদ এহ্‌সানুল হাবিব (জয়)

তাহরীকে জাদীদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ৫-১১-৯৯ তারিখের খুতবায় তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন। স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তারা সত্বর মুজাহিদগণের নিকট থেকে এমনভাবে ওয়াদা সংগ্রহ করবেন যেন কেউ এথেকে বাদ না পড়ে। আগামী রমযানের ২০ তারিখের মধ্যে যারা পুরোপুরি ওয়াদা আদায় করে দিবেন তাদের তালিকা ২৫শে রমযানের মধ্যে খাকসারের নিকট পাঠাবেন যাতে এগুলো হুযূর (আইঃ)-এর নিকট দোয়ার জন্যে পেশ করা যায়।

- মোহাম্মদ আব্দুল আযীয, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."

FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE

FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION

36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG

TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own. **with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.**

Office :	**Phone :**
79, Hoseni Dalan Road	Off : 239013
Dhaka-1211	Res : 804944
Factory	**Mobile 017527771**
36/D, Kakrail (1st Floor), Dhaka-1000	Fax : 880-2-805350

উপরে ঃ জামাতের দু'জন বিশিষ্ট বুযর্গের সাথে ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদল।

মাঝে ঃ ইউ.কে. সালানা জলসা '৯৯ উপলক্ষ্যে আগত মেহমানদেরকে মাওলানা আতাউল্লাহ্ কলীমের সাথে দেখা যাচ্ছে। বাংলা ডেস্কের মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব ও সর্ববামে আমেরিকা নিবাসী স্নেহের মনজুর সিকদারকেও দেখা যাচ্ছে।

নীচে ঃ ইউ.কে. সালানা জলসা '৯৯ তুরস্ক থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ।

New Vol. No. 62 ❑ 9th Issue November 15, 1999 ❑ Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

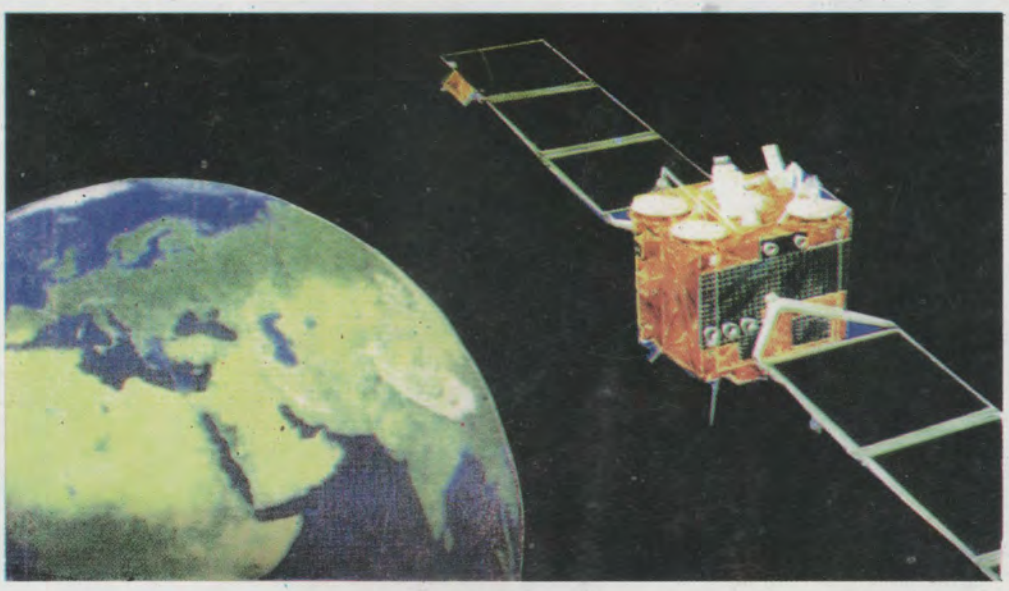

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

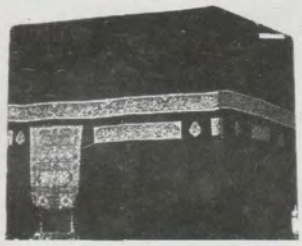

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গলবার লেকামাআল বাংলা অর্থাৎ বাংলা দর্শকদের সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইস্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মেঃ হাঃ।

এমটিএ MTA -এর দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ নিজ নিজ বাড়ীতে এমটিএ -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272